Amader Shikkha Kon Pathey

[Our Education: Search for Direction]

Abdullah Al Muti

আমাদের শিক্ষা কোন পথে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

আমাদের শিক্ষা কোন পথে

আবদুল্লাহ আল-মুতী

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর
বন্ধুদের হাতে

ভূমিকা

'শিক্ষা হল আমাদের সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত; বাজেটে সব খাতের মধ্যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ সর্বোচ্চ'—বছরের পর বছর জাতীয় নেতৃবৃন্দের এধরনের শ্রান্তিহীন ঘোষণা এদেশের মানুষকে আর আগের মতো তেমন চমৎকৃত করে না। বেশ কিছুকাল ধরে শিক্ষা খাতের জন্য এমনি 'সর্বোচ্চ বরাদ্দ' রাখা হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে যতগুলো সমস্যাসঙ্কুল ক্ষেত্র আছে তাদের মধ্যে শিক্ষা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া' যে শিক্ষার খাত, একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে আসলে মোট জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে আশেপাশের সব দেশের মধ্যে সে খাতে আমাদের ব্যয় সবচেয়ে কম। জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) যে হারে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের সুপারিশ করছে আমাদের ব্যয় তার তিন ভাগের একভাগ মাত্র। অবশ্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তহীন সমস্যার পেছনে বরাদ্দের স্বল্পতাই একমাত্র কারণ নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ দশা, শিক্ষাদানের নামে শুষ্ক তথ্যের কচকচি, কোচিং ক্লাসের রমরমা ব্যবসা, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের চাকরির জন্য অন্তহীন ধরনা এ সবই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতির পরিচয় দেয়।

অথচ সেই সঙ্গে দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদদের গবেষণার ফলাফল বলে, আজকের দিনে শিক্ষা ছাড়া কোনও দেশের পক্ষে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির দিকে এগোবার পথ নেই। আমরা যে এগোতে পারছি না তার জন্য আমাদের দুর্গত শিক্ষাব্যবস্থার নিঃসন্দেহে একটি বড় অবদান রয়েছে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি? কী করলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং বাংলাদেশ অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে আবার আগামী একুশ শতকের দিকে এগোতে পারে? এধরনের প্রশ্ন এদেশের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আজ আলোড়িত না করে পারে না।

যে কোনও সমস্যার সমাধানের প্রথম ধাপ হল তার চরিত্র উপলব্ধি করা; বস্তুনিষ্ঠভাবে তার গতি-প্রকৃতির হদিস করতে পারা; সমস্যার মূল দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে পারা। তারপর

সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব বিকল্প পথ রয়েছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা। এধরনেরই একটি চেষ্টা করা হয়েছে এ বইতে। এভাবে সব মানুষের সম্মিলিত পর্যালোচনা থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বহুভঙ্গিম জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান।

১৯৯২ সালের শুরুর দিকে নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগারের পক্ষ থেকে ড: করুণাময় গোস্বামী 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ (১৩০১-১৪০০)' নামে একটি সংকলন গ্রন্থের ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন আমাদের বিগত এক শ' বছরের শিক্ষা বিষয়ে একটি বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা লেখার জন্য। এই সংকলনের জন্য রচনাটি লেখার সময়েই এবিষয় নিয়ে আরও বিস্তৃত পরিসরে একটি বই লেখার ইচ্ছা আমার মনে জেগেছিল। অবশ্য ঐ সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত আমার 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ: শিক্ষা' শীর্ষক দীর্ঘ রচনার সঙ্গে এ বইয়ের প্রথম অংশের তিনটি অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর কিছুটা মিল থাকলেও এ বইয়ের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত ও ধাঁচ অনেকটাই ভিন্ন।

এ বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: 'কালের যাত্রার ধ্বনি', 'সবার জন্য শিক্ষা' ও 'চাওয়া-পাওয়ার হিসেব'। প্রথম খণ্ডে তিনটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে চারটি করে অধ্যায় রয়েছে। কোন কোন রচনা এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত হয়েছে বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ বইতে একযোগে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক-পাঠিকারা এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়বস্তুগত মিল এবং পর্যালোচনার ধারাবাহিকতা খুঁজে পাবেন।

এ বইয়ের বিষয়বস্তু সংকলন ও বিন্যাসে এবং রচনাশৈলীর পরিমার্জনায় বিভিন্ন সহকর্মী নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের মধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ম. হাবিবুর রহমান ও ড: শাহীদা আখতার এবং 'নায়েম'-এর ড: এম. এ. জলিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থা প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহ করেছেন। এছাড়া আরো যে সব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব জটিল সমস্যা আজ আমাদের জাতির অগ্রযাত্রার পথে বিপুল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে সে সবের উপলব্ধিতে ও সমাধানে এ বই যদি কিছুমাত্র সহায়তা করে তাহলেই এর প্রকাশ সার্থক হবে।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

সূচি

সারণি ও চিত্রতালিকা

সারণি

চিত্র

কালের যাত্রার ধ্বনি

উপনিবেশের দীঘল ছায়া

দুনিয়ার সবচেয়ে গরিব দেশ, একটি তলাবিহীন ঝুড়ি–এমনি নানা মুখরোচক অভিধায় ভূষিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে নানা বাধা আজ জগদ্দল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে; তাদের মধ্যে প্রধান হল এদেশের দুর্বল মানবসম্পদ আর তার পেছনের দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের মানুষের দীর্ঘকালের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের বেলাতেও তা ঘটেছে; এদেশের আজকের শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে অতীতের সমাজ জীবন আর শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহ্য নানাভাবে গভীর ছাপ ফেলেছে। আর তাই এই শিক্ষাব্যবস্থার সমকালীন নানা সমস্যার শেকড় খুঁজতে হলে বা সে সবের সমাধান পেতে হলে এই ঐতিহ্যের বিবেচনাকে বাদ দিয়ে করা হবে দুঃসাধ্য।

ইংরেজি আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় এক শ' বছর এদেশে ছিল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, তারপর আরো প্রায় এক শ' বছর ছিল প্রত্যক্ষ ব্রিটিশরাজের শাসন। বিশ শতকের ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কেটেছে পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায়। ব্রিটিশ শাসনে যে প্রায় দু'শ' বছর কেটেছে সেই ঔপনিবেশিক শাসনকালেই এ অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থার মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে। তাতে একদিকে যেমন প্রভাব পড়েছে ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন ও দৃষ্টিভঙ্গির তেমনি পড়েছে তার আগের ভারতীয় ঐতিহ্যের ছাপ।

এদেশের গত দু'শ' বছরের শিক্ষার পটভূমি বিবেচনা করলে তাতে যেসব প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে : বিদ্যাচর্চার প্রতি এক ধরনের ঐতিহ্যগত অনুরাগ (উনিশ শতকের প্রথম দিকেও বঙ্গদেশে এক লক্ষ প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের খবর জানা যায়); শিক্ষাক্ষেত্রে নানামুখী ধারার টানাপোড়েন এবং এই বিশ শতকের শেষভাগে পৌঁছেও এই শিক্ষাব্যবস্থায় উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারার প্রাধান্য।

ইংরেজি শিক্ষার গোড়াপত্তন

এদেশে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে দেশীয় সনাতন শিক্ষার একটি বিস্তৃত ধারা ছিল; মূলত একদিকে ছিল টোল ও পাঠশালা এবং অন্যদিকে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা। এদেশের সব প্রধান ধর্মমতেও বিদ্যা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে এই সনাতন শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ম্যাক্স ম্যুলার নামে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও ইতিহাসবিদ সরকারি নথিপত্র ও মিশনারিদের বিবরণ থেকে দাবি করেছেন যে, ইংরেজরা যখন এদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে তখন বাংলায় ৮০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল।

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেই এদেশে শিক্ষা পরিস্থিতি জরিপের প্রথম ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলা-বিহারে মিশনারি ও সাংবাদিক উইলিয়ম অ্যাডাম পর পর তিনটি জরিপ (১৮৩৫-৩৮) চালিয়েছিলেন; তা-ই এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তি। অবশ্য ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পরোক্ষভাবে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে মিশনারিদের উদ্যোগে নানা ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের মিশনে উইলিয়ম কেরি, জন মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শুরুতে এঁরা ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন।

১৭৬৫ সালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ করার পর থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। শাসন কাজে স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা এবং বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান ১৭৯১ সালে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও দেশীয় বিদ্যা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। এদিকে রাজকাজে অংশ নেবার জন্য স্বভাবতই এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার প্রমুখের উদ্যোগে 'সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ভারতীয় ও ইংরেজি ভাষা এবং এশিয়া ও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার' ব্যবস্থার জন্য কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (পরবর্তীকালে ১৮৫৫ সালে সরকারিকরণের পর

নাম হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ)। তার পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। এগুলোকে এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের গোড়াপত্তন বলে বিবেচনা করা যায়।

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব পায় ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে। তাতে বলা হয় কোম্পানি ভারতবর্ষীয়দের সাহিত্যের বিকাশ ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য প্রতি বছর অন্তত এক লক্ষ টাকা (১০,০০০ পাউন্ড) বরাদ্দ করবে। এর ফলে কোম্পানির পক্ষ থেকে সরাসরিভাবে তেমন উদ্যোগ দেখা না গেলেও মিশনারিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি হয়। তাদের সে শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ও খ্রিস্ট ধর্মের সঙ্গে দেশীয় ভাষা ও নানা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় যেমন ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এসবের চর্চার ব্যবস্থাও থাকত। ১৮১৭ সালে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনকে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য পরের বছর প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা স্কুল সোসাইটি। এ দু'টি সংস্থাই কিছুদিন পর সরকারি অনুদানের আওতায় আসে। এদেশের সনাতন শিক্ষাব্যবস্থায় নারী-শিক্ষার আয়োজন ছিল খুব দুর্বল; মিশনারিরা এক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেয়। জন বেথুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের চেষ্টায় ১৮৪৯ সালে কলকাতায় মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল (পরবর্তীকালের বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়।

উইলিয়ম অ্যাডাম ত্রিশের দশকে শিক্ষা জরিপ শুরু করেছিলেন প্রথমত নিজেরই উদ্যোগে; পরে গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁকে কমিশনার হিসেবে নিযুক্তি দেন। অ্যাডামের প্রথম রিপোর্টে বলা হয় বাংলা ও বিহারে প্রতি ৪০০ জন লোকের জন্য একটি পাঠশালা অর্থাৎ মোট এক লক্ষ পাঠশালা রয়েছে। এসব পাঠশালা মূলত গৃহকেন্দ্রিক ছিল বলে মনে হয়। ১৮৩৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজশাহী জেলার নাটোর থানা সম্পর্কে তথ্য ছিল। তাতে দেখা যায় ৪৫২টি গ্রামে ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, আর ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৬২ অর্থাৎ প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে ১৩ জন ছাত্র ছিল। এছাড়া ছিল পরিবারভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষাকাল ছিল ৮ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। শিক্ষকদের গড় বেতন ছিল মাসিক পাঁচ টাকা; শিক্ষার্থীদের কোন বেতন দিতে হত না। তবে এসময়ে নারী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থার কথা জানা যায় না।

অ্যাডামের তৃতীয় রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের শিক্ষাচিত্র পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম, ত্রিহুত ও দক্ষিণ বিহার এই পাঁচটি জেলা মিলে ছিল মোট ২,৫৬৭টি স্কুল ও ৩০,৯১৫ জন ছাত্র (গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে ১২ জন)। এর মধ্যে ছিল নানা ধরনের বিদ্যালয়—বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, নারী বিদ্যালয় ও পারিবারিক বিদ্যালয়। সাধারণত বিদ্যালয় বলতে বোঝাত কারো উঠান বা মন্দির বা মসজিদ সংলগ্ন খানিকটা জায়গা। ছাপা বই ছিল না; লেখা হত শ্লেট বা ধুলোয়, কখনো খাগ, ভুসোকালি বা চকখড়ি

দিয়ে। স্কুল বসত সময়-সুযোগ মতো কখনো সকালে, কখনো বিকালে। কড়া বেতের শাসন চলত। উঁচু ক্লাসের ছাত্রকে দিয়ে নিচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার রেওয়াজ ছিল। উচ্চ শ্রেণীর বা জমিদার-ব্যবসায়ীদের সন্তানদের জন্য পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

এসময়ে কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজেদের মুনাফার স্বার্থে একটি দক্ষ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সেজন্য স্থানীয় কর্মকর্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এদের মাধ্যমে কিছুটা শিক্ষা যদি 'থিতিয়ে' সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়ায় তাহলে আরো ভাল। মূলত এদেশের নেতৃস্থানীয় অর্থাৎ নবাব-রাজা-জমিদার প্রভৃতি বনেদি পরিবারের সন্তানদের জন্যই কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) এবং কাশী (১৭৯১) ও কলকাতায় (১৮২৪) সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে, এসব বনেদি ব্যক্তিরা শিক্ষিত হয়ে সমাজের অন্য সাধারণ মানুষদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে। কোম্পানির হিসেব মতো উচ্চশ্রেণীর লোকদের শিক্ষা হবে মূলত ইংরেজি ভাষায়, তারপর তারা সাধারণ লোকদের শিক্ষা দেবে নানা আঞ্চলিক ভাষায়।

এই নিম্নমুখী পরিস্রবণ নীতিতে (Downward Filtration Theory) শিক্ষা বিস্তারের কথিত উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয় নি, কারণ এজন্য কোম্পানি যে অর্থ বরাদ্দ করে তা ছিল অতি সামান্য। তাছাড়া যে অল্প সংখ্যক ইংরেজি-শিক্ষিত লোক সৃষ্টি হল তারা দ্রুত দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য পরে পরিস্রবণ নীতি ব্যর্থ বলে অন্তত মৌখিকভাবে হলেও পরিত্যক্ত হয় এবং উনিশ শতকের শেষে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকলে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেমন স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে তেমনি স্বদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যও এগিয়ে আসে।

অনুগত কর্মচারী সৃষ্টিই লক্ষ্য

উনিশ শতকের শুরুর দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব মূল প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেগুলোর মধ্যে একটি হল শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে। কোম্পানির শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান টমাস ব্যাবিংটন মেকলে নীতি নির্ধারণী এক বিখ্যাত মিনিট-এ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫) বললেন, কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হল ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্মচারি সৃষ্টি করা ("... a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."); দেশীয় ভাষা বা দেশীয় শিক্ষা দিয়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সরকারি অর্থ শুধু ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করাই সঙ্গত হবে। এই নীতির অনুসরণে ১৮৩৭ সাল থেকে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে সব ধরনের সরকারি কাজকর্ম ও আইন-আদালতের মাধ্যম হিসেবে চালু করা হল; ১৯৪৪

সাল থেকে নিয়ম হল ইংরেজি জানা লোকদেরকে সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্বভাবতই এর ফলে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস ১৯ জুলাই ১৮৫৪ যে বিখ্যাত শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (Wood's Education Despatch) ঘোষণা করে তাতেও মূলত মেকলের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়। তবে বলা হল ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের অর্থ এ নয় যে, দেশীয় ভাষার চর্চা ব্যাহত করা হবে অথবা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করা হবে। এই নীতিমালার অংশ হিসেবে বাংলাসহ পাঁচটি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় (১৮৫৫) এবং কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৭)। এগুলোর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে। সে সময় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ করত, সেখানে সরাসরি শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকবে এমন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হয়।

উড-এর শিক্ষানীতির একটি বৈশিষ্ট্য হল তা শিক্ষার পরিস্রবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এজন্য দেশীয় ভার্নাকুলার বিদ্যালয় ও অ্যাঙ্গলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়কে এক পর্যায়ে আনার কথা বলা হয়। দেশীয় স্কুলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সরকারি অনুদান দেবারও ব্যবস্থা করা হয়। বলা হয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিপুল ব্যয় সরকার ও জনগণের সমভাবে বহন করা প্রয়োজন; আর স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করার উপায় হিসেবেই সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। তবে এই অনুদান পাবার জন্য বিদ্যালয়কে কতকগুলো শর্ত পালন করতে হবে : (১) অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাদান পদ্ধতি, (২) সুষ্ঠু স্থানীয় ব্যবস্থাপনা, (৩) পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা এবং (৪) যত কমই হোক, মাসিক ছাত্র বেতনের ব্যবস্থা।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এ সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও (নর্মাল স্কুল) স্থাপন করা হয়। ক্রমে ক্রমে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রসার ঘটতে থাকে আর সনাতন প্রথার দেশীয় বিদ্যালয়গুলো অবহেলায় ধ্বংসের পথে যেতে থাকে। দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ সম্পর্কে উড-এর ডিসপ্যাচ-এ যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা বহুদিন ধরে বাস্তবে কার্যকর হয় নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করার ব্যবস্থা হয় এর প্রায় সাত দশক পরে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রমুখের নেতৃত্বে দেশে এক ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। তাঁরা

ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তন ও বাংলা ভাষা বিকাশের উদ্যোগ নেন। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) এই রেনেসাঁ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বলতে গেলে রামমোহন প্রমুখের উদ্যোগের ফলেই বাংলাদেশ অন্ধকারময় মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। উড-এর শিক্ষানীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ মূলত ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে নেওয়া হলেও এই আধুনিকতার আন্দোলনে সহায়ক হয়েছিল।

অনুগত রাজকর্মচারী সৃষ্টির একই উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানি মুসলিম সমাজের শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি দেয়। মোগল শাসনের অবক্ষয়ের কালে এবং ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে মুসলিম সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে হিন্দু সমাজ সাধারণভাবে যতটা সুবিধে পেল মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে দূরে থেকে ঠিক তেমনি পিছিয়ে পড়তে লাগল। মোগল আমলে দরবারের যে সব প্রশাসনিক দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে ছিল তা কোম্পানির রাজত্বে ক্রমে ক্রমে হিন্দুদের হাতে চলে যায়। এতে মুসলমান সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং তারা আরো বেশি করে পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে ধর্মীয় শিক্ষার গণ্ডির মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে ফেলতে আরম্ভ করে। সে সময়ের মুসলিম সমাজের দুর্গতির কথা উইলিয়ম হান্টার The Indian Musslmans (১৮৭১) গ্রন্থে বেশ দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিছু সংখ্যক মুসলমানকে সরকারি চাকুরির জন্য উপযুক্ত করে তোলা। ১৮২৪ সাল থেকে এই মাদ্রাসায় ইংরেজি শেখাবারও ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাতে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত তেমন অগ্রগতি ঘটে নি। ১৮৭১ সালের একটা হিসেবে দেখা যায় তখনকার বাংলা-আসাম মিলিয়ে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানদের হার ছিল ৩২.৩ শতাংশ; কিন্তু স্কুল পর্যায়ে তাদের হার ছিল ছাত্রসংখ্যার মাত্র ১৪.৫ শতাংশ (১,৯৩,৩০২ জনের মধ্যে ২৮,০৯৬ জন) আর কলেজ পর্যায়ে মাত্র ৪ শতাংশ (১,২৮৭ জনের মধ্যে ৫২ জন)। সেকালে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্যার সৈয়দ আহমদ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও অনেক ইংরেজ নারী-পুরুষের জীবন

রক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি কর্তৃপক্ষের সুনজর লাভ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ভারতে ইংরেজ শাসন স্থায়ী হবে এবং বিজয়ী ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিজিত মুসলমানদের যতই ক্ষোভ থাকুক ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া তাদের কল্যাণ নেই; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে সামাজিক সংস্কার সাধন ছাড়া মুসলমান সমাজের সমূহ ধ্বংস অনিবার্য।

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৬৯-৭১ এই দু'বছর ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পে ইংরেজদের অগ্রগতি দেখে চমৎকৃত হন। দেশে ফিরে তিনি অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের ধরনের একটি কলেজ আলীগড়ে প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেন। ১৮৭৫ সালে মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ নামে এই কলেজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে এই কলেজই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোহামেডান এডুকেশনাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করে তার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এসব চেষ্টার ফলে মুসলিম ছাত্রদের জন্য পৃথক বৃত্তি প্রবর্তন করা হয় এবং সরকারি স্কুলগুলোতে পৃথক ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে।

উচ্চশিক্ষার বিস্তার

সরকারিভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের নীতি গ্রহণ করা হলেও শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হতে থাকে নামমাত্র; তার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এত দ্রুত নানা ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়তে থাকে যে, বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের পক্ষে তা নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। একের পর এক নতুন কলেজ স্থাপিত হতে থাকে : ঢাকা কলেজ (১৮৪১), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৫), বহরমপুর কলেজ (১৮৫৩), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা (১৮৮৪), নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৮৬), ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), সিলেট এম. সি. কলেজ (১৮৯১), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯), ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ (১৯০১) ইত্যাদি। বিশ শতকের শুরুতে (১৯০২ ইং) সারা ভারতে মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে যত শিক্ষার্থী ছিল তার অর্ধেকেই ছিল বঙ্গদেশে। স্বভাবতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় এবং অতি অল্প ব্যয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত বলে শিক্ষার মান ছিল বেশ নিচু। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় ছাত্র বেতন ছিল সবচেয়ে কম; পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হারও ছিল সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের চিত্র সারণি ১ থেকে পাওয়া যাবে।

সারণি ১ : উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার

সন	প্রাথমিক শিক্ষা		মাধ্যমিক শিক্ষা		কলেজ শিক্ষা		বিশ্ববিদ্যালয়
	বিদ্যালয়	শিক্ষার্থীসংখ্যা	বিদ্যালয়	শিক্ষার্থীসংখ্যা	কলেজ	শিক্ষার্থীসংখ্যা	
১৮৭০-৭১	১৬,৪৭৩	৬০৭,৩২০	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৩
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২,০৬১,৫৪১	৩,৯১৬	২১৪,০৭৭	তথ্য নেই	তথ্য নেই	৩
১৯০১-০২	৯৮,৫৩৮	৩,২৬৮,৭২৬	৫,৪৯৩	৫৫৮,৩৭৮	১৯১	২৩,০০৯	৪
১৯২১-২২	১৫৫,০১৭	৬,১০৯,৭৫২	৭,৫৩০	১,১০৬,৮০৩	১৬৫	৪৫,৪১৮	১০
১৯৩৬-৩৭	১৯২,২৪৪	১০,২২৪,২৮৮	১৩,০৫৬	২,২৮৭,৮৭২	২৭১	৮৬,২৭৩	১৫

তথ্যসূত্র

1. Government of India, *Indian Education Policy*. Calcutta : Superintendent. Government Printing. India. 1904.
2. Syed Nurullah and J. P. Naik. *History of Education in India During the British Period*. Bombay : Macmillan and Co. 1943. P. 467.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৮২ সালে স্থাপন করা হয় ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার উইলিয়ম হান্টার। সে সময়ে সমালোচনা হচ্ছিল যে, সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার মধ্যবিত্ত সমাজের মনে স্বাধীনতার বীজ বুনে দিচ্ছে এমন ধারণাও শাসকদের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করেছিল। হান্টার কমিশন প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ রিপোর্ট তৈরি করেন; তা থেকে উনিশ শতকের শেষভাগে এদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতকগুলো সুপারিশ করেন। বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমগ্র জনগণের মধ্যে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে এমন শিক্ষার বিস্তার ঘটানো যা বিভিন্ন পেশার জন্য তাদের যোগ্য করে তুলবে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বেশি সরকারি অর্থ বরাদ্দের কথাও এতে বলা হয়।

ইতোমধ্যে ১৮৭০ ও ১৮৭৬-এর শিক্ষা আইনে বিলেতে অনেকগুলো 'স্কুল ডিস্ট্রিক্ট' সৃষ্টি করা হয় এবং তাদেরকে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেই আদর্শ অনুসরণ করে কমিশন প্রস্তাব করেন যে, এদেশেও প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মূলত জেলা ও পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া যেতে পারে; সেজন্য প্রতিটি জেলা ও পৌর এলাকায় একটি করে স্কুল বোর্ড থাকতে পারে। কমিশন স্থানীয় উদ্যোগে

প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দেবার নীতি পুনর্ব্যক্ত করেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদান করে এমন সব স্থানীয় বিদ্যালয় এই নীতির আওতায় পড়বে। স্কুল বোর্ডগুলো শুধু এমন জায়গায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবে যেখানে কাছাকাছি কোন বিদ্যালয় নেই। সরকার এসব বিদ্যালয়কে যে সাহায্য দেবে তা তাদের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে কিছু ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; সেজন্য বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার কথাও বলা হয়।

এই শিক্ষা কমিশন নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, তার পরিবর্তে পরিদর্শকরা সরেজমিনে পরিদর্শন করে শিক্ষার মান পরীক্ষা করে দেখবেন। অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলো অবশ্যই পরিদর্শনের মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে হবে। তবে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণে স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এছাড়া স্কুল বিভিন্ন ঋতুতে কোন্ সময়ে ও কতক্ষণ বসবে সে ব্যাপারেও নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কমিশন সারা দেশে অসংখ্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকদের একটি প্রধান দায়িত্ব হবে এলাকার নর্মাল স্কুলের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা এবং তার তত্ত্বাবধান করা। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও কর্মসূচিতে যাতে স্থানীয় সমস্যা প্রতিফলিত হয় এবং স্থানীয় লোকের সহযোগিতা পাওয়া যায় সেজন্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে স্থানীয়ভাবে। বিদ্যালয়ের অর্থসংস্থানের জন্য দু'ধরনের ফান্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়–মিউনিসিপ্যাল ফান্ড ও লোকাল বোর্ড ফান্ড। এসব ফান্ড থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হবে এবং নতুন বিদ্যালয় ভবনও নির্মাণ করা হবে। স্থানীয়ভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তার অর্ধেক অথবা মোট ব্যয়ের অর্ধেক সরকারি অনুদান দেবার প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য এসব প্রস্তাব বাস্তবক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে তেমন সহায়ক হয় নি, কেননা এজন্য যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন তা বরাদ্দের কোন নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাধ্যমিক শিক্ষার বেশ কিছুটা প্রসার ঘটলেও আরো প্রসার জরুরি হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রসার ঘটাবার পদ্ধতি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। একদল বলছিলেন, সরকারি স্কুলগুলো বেসরকারি স্কুলের তুলনায় বেশি দক্ষ, কাজেই আরো বেশি সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হোক। আরেক দল বলছিলেন, বেসরকারি স্কুলে কম বেতনে পড়ানো যায়, কাজেই বেসরকারি স্কুলের মাধ্যমে অল্প ব্যয়ে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো সম্ভব হবে। কমিশন এসব প্রস্তাব বিবেচনা করে বললেন, প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা নয়। কাজেই সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উদার হস্তে অনুদান দিতে পারেন, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সরাসরি ব্যবস্থাপনা থেকে সরকারের

বিরত থাকা উচিত। যে সব সরকারি মাধ্যমিক স্কুল আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলে সম্বন্ধে কমিশন বললেন, এগুলোকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে তবে এই শর্তে যে, তাতে স্কুলের শিক্ষার মান নেমে যাবে না। তাছাড়া যেসব এলাকা জনসাধারণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গতি নেই সেখানে বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় সরকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করবেন, তবে সরকারের দায়িত্ব হবে প্রতিটি জেলায় একটি মাত্র ভাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা–তা সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক; একটির বেশি স্কুল প্রয়োজন হলে তা বেসরকারি উদ্যোগেই হতে হবে।

ধর্মীয় শিক্ষার সমস্যা তুলল প্রধানত খ্রিস্টান মিশনারিরাই। তারা বলল ঈস্ট ইন্ডিয় কোম্পানির ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ভারতের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে তাছাড়া তাদের মতে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতে পারে না, কাজেই সব সরকারি স্কুলে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; অবশ্য ধর্মীয় শিক্ষা বলতে তারা খ্রিস্ট ধর্মই বোঝাচ্ছিল। এছাড়া তাদের স্কুলের সব শিক্ষার্থীকে তারা বাইবেল শেখাবার স্বাধীনতা চাচ্ছিল। এই শেষের দাবিটিই শুধু সরকার মেনে নেয়। ১৮৫৭-র সিপাই বিপ্লবের পর হিন্দু ও মুসলমানরাও দাবি করতে থাকে যে, স্কুলে তাদের ধর্ম শেখাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এসব জটিলতার সম্মুখীন হয়ে কমিশন সুপারিশ করে যে, সব সরকারি স্কুল ধর্মনিরপেক্ষ থাকবে, তবে বেসরকারি স্কুলে যে কোন ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে; অবশ্য সরকারি অনুদান শুধু ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার জন্যই দেওয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

১৮৫৪ সালের ডিসপ্যাচ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো কলকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব ছিল পরীক্ষ গ্রহণের মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলার নানা ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করে যথাযথ ডিগ্রি দানের ব্যবস্থা। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি সিনেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যার ফেলোসংখ্যা হবে ২৬ জন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই ফেলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি করল। তখনকার লন্ডন ইউনিভার্সিটির মডেলে এখানেও শুধু কলেজের অনুমোদনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু নিজস্ব অঙ্গনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। তবে লন্ডন ইউনিভার্সিটি তার পরের বছর থেকেই অনুমোদন দান ছাড়াও নিজস্ব অঙ্গনে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করে।

এদেশে পাশ্চাত্য ধরনের কলেজ ইংরেজ মিশনারিরাই প্রথম স্থাপন করেন। পরবর্তী সময়ে আধুনিক ধরনের কলেজ সরকারি উদ্যোগেও প্রতিষ্ঠা করা শুরু হয়। প্রথম দিককার এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঠিক আজকের কলেজের ধরনে ছিল না। এর অধিকাংশই ইংরেজি শেখানোর স্কুল থেকে গড়ে উঠেছিল; তাতে একই প্রতিষ্ঠানে যেমন

বর্ণ পরিচয় দেওয়া হত তেমনি শেক্সপিয়র ও অ্যাডাম স্মিথেরও চর্চা হত। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই সত্যিকার আধুনিক ধরনের কলেজ স্থাপন শুরু হয়। এরপর শুধু বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কলেজে ভর্তি করা হত; কলেজের শিক্ষাক্রমও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলেজ শিক্ষারও বিস্তার ঘটতে লাগল। সরকারি উচ্চ পদ পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হত।

১৮৮২-র আগে পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারিদের একাধিপত্য ছিল। হান্টার কমিশনের রিপোর্টের পর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তবে এ সময়ে যেসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার বেশির ভাগই ছিল কলা বিষয়ে, খুব কম কলেজেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া মেয়েদের শিক্ষার প্রসারও হয় খুব কম। উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধে প্রধানত ভোগ করতে থাকে হিন্দু উচ্চ বর্ণের লোকেরা—বিশেষত ব্রাহ্মণরা। তাছাড়া আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষার বা এসব ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না।

এসময়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত বিস্তার যতটা ঘটে সে অনুপাতে শিক্ষার মানের দিকে অতটা দৃষ্টি দেওয়া হত না। তার ফলে শিক্ষার মানে যথেষ্ট অবনতি ঘটতে থাকে। অনেক কলেজেই উপযুক্ত শিক্ষক, উপকরণ, পাঠাগার এসব ব্যবস্থার যথেষ্ট ঘাটতি ছিল এবং এগুলো মূলত কোচিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাদের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করা।

গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৮-১৯০৫) শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শিক্ষা সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক ও অন্য কিছু ব্যক্তিকে ১৯০১ সালে সিমলায় একটি সম্মেলনে ডাকেন। এটাই ছিল প্রথম সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন; তবে কোন ভারতীয়কে এতে অংশ গ্রহণের জন্য ডাকা হয় নি। সম্মেলন ১৫ দিন ধরে চলে এবং এতে ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এসব প্রস্তাবের ভিত্তিতে কার্জন শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ। কমিশন সেবছরই তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ইতোমধ্যে ১৮৮৮ সালের আইনে লন্ডন ইউনিভার্সিটির চরিত্রে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বললেন, এই আদর্শে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে শিক্ষাদানের কেন্দ্র। কোন অধিভুক্ত কলেজ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও উপযুক্ত উপকরণ ছাড়া অনুমোদন পাবে না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে মূলত শিক্ষকরাই জড়িত থাকবেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ সিনেট খুব বড় হবে না। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯০৪ সালে পাস হল একটি বিশ্ববিদ্যালয় আইন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনও এসময়ে সংস্কার করা হয় এবং চালু হয় ১৯০৫ সালের জুলাই থেকে।

এই আইনের একটি প্রধান দিক হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধির প্রসার। ১৮৫৭ সালের আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রি দান। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, জাদুঘর স্থাপন এবং শিক্ষা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হল। তাছাড়া সিনেটের ফেলোসংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-র মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল; সাধারণ ফেলোদের কার্যকাল নির্ধারিত হল পাঁচ বছর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদের মধ্যে ১০ জনকে নির্বাচিত করবে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা, ১০ জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ নির্বাহের জন্য একটি সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠা এবং তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হল। এছাড়া কলেজের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির জন্য আরো কঠোর নিয়ম করা হল এবং এসব শর্তের যথাযথ পালনের জন্য সিনেট কলেজগুলো পরিদর্শন করবে এমন ব্যবস্থা রাখা হল। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অধিভুক্তির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাও নির্দিষ্ট করে দেবার ব্যবস্থা করা হল।

এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের দক্ষতা বৃদ্ধি পেল। তাছাড়া অধিভুক্তির নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা কলেজগুলোতে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হল। এর ফলে প্রথম দিকে কিছু কলেজ বন্ধ করে দিতে হলেও পরে কলেজের সংখ্যা আবার ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। তবে কলেজের সংখ্যা যতটা বাড়ল তার চেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো দ্রুত বাড়তে থাকল। এছাড়া তখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা চালু হল।

মাধ্যমিক শিক্ষা

উনিশ শতকের শুরুতে এদেশে জাতীয়তাবাদের জোর হাওয়া বইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়রা বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলো তাদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং শিক্ষিত সমাজ সে সবের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। ১৯০৪ সালে একটি রেজলিউশনে ভারত সরকার এসব সমালোচনা যে অনেকাংশেই যুক্তিযুক্ত তা স্বীকার করতে বাধ্য হন :

"পরিমাণগত দিক থেকে এর [শিক্ষাব্যবস্থার] অপর্যাপ্ততা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পাঁচটির মধ্যে চারটি গ্রামে কোন প্রাথমিক স্কুল নেই, ছেলেদের চারজনে তিনজনই কোন শিক্ষা পায় না, চল্লিশজনে মাত্র একজন মেয়ে আদৌ কোন স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। গুণগত দিক থেকে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো হল : (১) উচ্চশিক্ষার

একমাত্র লক্ষ্য সরকারি চাকুরি, তাই এর পরিসর খুবই সীমিত; (২) পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ; (৩) শিক্ষাক্রম অতিমাত্রায় সাহিত্যধর্মী; (৪) স্কুল ও কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশের চেয়ে মুখস্থবিদ্যার ওপর বেশি জোর দেয়, যথার্থ শিক্ষার পরিবর্তে এক ধরনের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি প্রাধান্য পায়; (৫) ইংরেজি শিক্ষার নামে দেশীয় ভাষাগুলোর চর্চায় অবহেলা করা হচ্ছে।"

'উড'-এর শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা থাকলেও বাস্তবে সেদিকে কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয় নি। যেহেতু 'আদর্শস্থানীয়' সরকারি স্কুলে কোন কারিগরি বিষয় স্থান পায় নি, তাই আর্থিক সঙ্গতিতে দরিদ্র বেসরকারি স্কুলগুলো এরকম কোন বিষয় অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন বোধ করে নি। সব মিলিয়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যেমন একদিকে বেড়েছে তেমনি অন্যদিকে সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছে। তার ফলে উইলিয়ম অ্যাডামের জরিপে (১৮৩৫-৩৮) যেখানে বয়স্ক সাক্ষরতার হার পাওয়া যায় ৪.৪ শতাংশ, সেখানে তার প্রায় এক শতাব্দী পর ১৯২১-২২ সালে এই হার দাঁড়ায় মাত্র ৫.৩ শতাংশে।

সে যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সমালোচনার মুখে লর্ড কার্জন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

১. এর আগে সরকারি অনুদান পেতে হলে শিক্ষা বিভাগের কতকগুলো শর্ত পূরণ করতে হত। যেসব স্কুল সরকারি অনুদান চাইত না তাদের জন্য কোন শর্ত ছিল না। এখন থেকে সরকারি অনুদান পাক বা না পাক সব স্কুলেরই সরকারি অনুমোদনের জন্য কিছু শর্ত পালনের বিধান করা হল।

২. স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাতে হলে শুধু শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন হলে চলবে না, বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনুমোদন প্রয়োজন হবে। ১৯০৪ সালের আইনে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের অনুমোদনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করবে এমন বিধান করা হল।

৩. অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সুবিধা লাভের ব্যবস্থাও করা হল—যেমন সরকারি অনুদানের যোগ্যতা, বৃত্তি পরীক্ষা ও অন্যান্য সরকারনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ এবং অন্যান্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার যোগ্যতা অনুমোদনের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের জন্য পরিদর্শক কর্মকর্তার সংখ্যা বাড়ানো হল।

৪. অননুমোদিত বিদ্যালয় থেকে অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বদলি বন্ধ করা হল। তাতে আগে যেসব স্কুল অনুমোদন ছাড়া চলত এবং তাদের ছাত্ররা কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিতে পারত তাদের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিল।

কার্জন প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি করে উচ্চমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করলেন, যাতে সেটি অন্যান্য বিদ্যালয়ের জন্য আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে পারে। তাছাড়া বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো যাতে সরকারি বিদ্যালয়ের সমমানে পৌঁছতে পারে সেজন্য এসব বিদ্যালয়ের জন্য অনুদানের পরিমাণ বাড়ানো হল। শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের জন্য কার্জন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কার্জনের নীতি একাধারে সংখ্যাগত বিস্তার ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। তিনি বুঝেছিলেন এতদিন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ না হওয়াই এক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার মূল কারণ; সেজন্য তিনি আবর্তক ও অনাবর্তক অনুদান বৃদ্ধির উদ্যোগ নেন। তার ফলে প্রাদেশিক সরকার লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিকে তাদের শিক্ষা খাতের ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশের জায়গায় অর্ধেক বরাদ্দ করতে এবং বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের জন্য অনুদান বাড়াতে সমর্থ হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম সংস্কার এবং শিক্ষকদের বেতন ও প্রশিক্ষণের উন্নত ব্যবস্থার উদ্যোগও তিনি নেন, বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার ছিল খুবই কম। তিনি মনে করতেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণকাল অন্তত দু'বছর হওয়া প্রয়োজন এবং গ্রামীণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রশিক্ষণের একটি বিষয় হওয়া প্রয়োজন 'কৃষির মূলনীতি'। গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম শহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতে যে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের মূল দায়িত্ব ছিল কলেজগুলোতে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি দান। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস-চ্যান্সেলর হবার পর (১৯০৬) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ দান ও কিছু কিছু গবেষণার ব্যবস্থা চালু হয়। ক্রমে ক্রমে এক দশকের মধ্যে সকল স্নাতকোত্তর শিক্ষা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে কেন্দ্রীভূত হয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চমানের গবেষণার জন্য সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে।

১৯১৩ সালে ভারত সরকার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে একটি রেজলিউশন গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয় শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হবে এবং মফস্বলের কলেজগুলোকে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করার জন্য ১৯১৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করা হয়। লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার মাইকেল

স্যাডলার এর সভাপতি ছিলেন বলে এটি সাধারণভাবে স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশন ১৯১৯ সালে পাঁচ খণ্ডের সুবৃহৎ রিপোর্ট দাখিল করে।

স্যাডলার কমিশন মনে করে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২) রিপোর্ট তেমন কোন অবদান রাখতে না পারার প্রধান কারণ হল প্রথমটির আওতা থেকে উচ্চতর শিক্ষাকে এবং দ্বিতীয়টির আওতা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাইরে রাখা হয়েছিল। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সমস্যাগুলো একযোগে বিবেচনা না করলে কোনটারই সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো একযোগে পর্যালোচনা করে। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রধান প্রস্তাবগুলো ছিল :

১. মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে সীমারেখা টানা প্রয়োজন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার শেষে, ম্যাটিকুলেশনের শেষে নয়।
২. সেজন্য সরকারের কর্তব্য হল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নামে নতুন ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠা; এগুলো পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে অথবা নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত হতে পারে।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মানদণ্ড হবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া।
৪. মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কমিশন লক্ষ্য করে যে, ইংল্যান্ড ও বঙ্গদেশ দুইয়েরই লোকসংখ্যা প্রায় সমান-মোটামুটি সাড়ে চার কোটি; দু'জায়গাতেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যাও মোটামুটি সমান-প্রায় ২৬,০০০। তবে বাংলাদেশে অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়ে কলা বিষয় নিয়ে। দ্বিতীয় বৈসাদৃশ্য হল বিলেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮টি আর বাংলায় রয়েছে মাত্র একটি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। কমিশনের মতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ ও শিক্ষার্থীসংখ্যা এত বেশি যে, তাতে শিক্ষার মান বজায় রাখা কঠিন। সেজন্য অবিলম্বে ঢাকায় একটি একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এছাড়া মফস্বলের কলেজগুলোর মান এমনভাবে বাড়াতে হবে যেন কিছু কিছু জায়গায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ইন্টারমিডিয়েটের পর দু'বছরের পরিবর্তে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাস কোর্সের পাশাপাশি অনার্স কোর্স খোলার প্রস্তাব করা হয়।

শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন প্রস্তাব করে যে, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ খোলা হোক; এছাড়া ইন্টারমিডিয়েট ও বি.এ.

ক্লাসে শিক্ষা একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হোক। ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিশন প্রস্তাব করে।

বিশ শতকের শুরুতে শিক্ষাঙ্গনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যর্থ উদ্যোগ। লর্ড কার্জনের নীতির ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় কিছুটা অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু সরকারি কর্মকর্তারা বলতে থাকেন সংখ্যাগত বিস্তারের ওপর বেশি গুরুত্ব না দিয়ে গুণগত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেখান যে, ১৯১১-১২ সালে ভারতে সাক্ষরতার হার দাঁড়ায় মাত্র ছ' শতাংশ; প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেদের মধ্যে শিক্ষার্থীর হার বয়ঃক্রমের ২৩.৮ শতাংশ আর মেয়েদের মধ্যে মাত্র ২.৭ শতাংশ। সেজন্য সর্বজনীন শিক্ষার স্বার্থে তাঁরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি জানাতে থাকেন। এই মর্মে বড়লাটের আইনসভার সদস্য জি. কে. গোখলে ১৯১০ সালে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাতে কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ১৬ মার্চ ১৯১১ তিনি ৬-১০ বছরের বালকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিল উত্থাপন করলেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন সরকারের মনোনীত। তাঁদের বিরোধিতায় এই বিল পাস করা সম্ভব হয় নি, তবে এর ফলে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

১৯১৯ সালের প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে ১৯২১ সালে নির্বাচিত ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হয়। এসময়ে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন প্রণয়ন আরম্ভ হয়। বঙ্গদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯১৯ ও গ্রামাঞ্চলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০ পাস হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও অপচয়ের অজুহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচির রাশ টেনে ধরা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যত একটা সংকোচনের নীতি চালু থাকে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এক নতুন তাগিদ দেখা দেয়। কিন্তু এর কিছুকালের মধ্যেই যখন বঙ্গভঙ্গ রদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন মুসলমান সমাজে হতাশা সৃষ্টি হয়। ১৯১১ সালের শেষে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্য ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। তার প্রায় এক দশক পর ১ জুলাই ১৯২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন গোড়ায় লন্ডনের আদলে পরীক্ষা গ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চালু হয়, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের আদলে একক আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। স্পষ্টতই এর লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গে মুসলিম সমাজের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। সেজন্য এর কোর্ট-এ যথেষ্ট মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম শিক্ষক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। ১৯২১ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় তখন মোট ৬০ জন শিক্ষকের মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৮ জন—তাদেরও ৬ জন আরবি ও ফার্সি বিভাগে (অন্য দু'জন ছিলেন এ. এফ. রহমান ও মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)। পনের বছর পর মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে ১২৪ জনের মধ্যে ২৪ জন হয় (তার মধ্যে ১৪ জন আরবি ও ফার্সি বিভাগে)। বিজ্ঞান ও অর্থনীতি মিলিয়ে ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন মুসলমান (কাজী মোতাহার হোসেন)। ১৯৩৭ সালে মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ১,৭৫৪; তাদের মধ্যে মুসলমান মাত্র ৩৯৫ জন অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ শতাংশ। প্রথম পাঁচ বছরে মাত্র ৪৫ জন মুসলিম ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে বেরোয়। তবে পরবর্তী দশকগুলোতে পূর্ববঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হার্টগ কমিটি

১৯১৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী সংস্কারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি রয়্যাল কমিশন স্থাপিত হয়েছিল। এই কমিশনকে ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয় এবং প্রয়োজনবোধে একটি সাহায্যকারী কমিটি নিয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী কমিশন স্যার ফিলিপ হার্টগ-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। হার্টগ এর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যরূপে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলররূপে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন। হার্টগ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্যাগুলো এভাবে নিরূপণ করেন :

১. দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যে ধরনের লোক প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা তৈরি করতে পারছে না। শিক্ষার মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে—পরীক্ষায় ব্যাপক হারে অকৃতকার্যতা তার প্রমাণ দেয়।

২. শিক্ষার উচ্চমানের জন্য একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ই সবচেয়ে উপযোগী; কিন্তু ভারতের বাস্তব অবস্থায় শুধু অনুমোদন দেয় এমন বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রয়োজন আছে। সব অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীর জন্য

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান করতে হলে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা শুধু নয়, তার নিচের অন্যান্য স্তরের শিক্ষার মানের স্বার্থেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা জরুরি।

শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিটি বিশেষভাবে অনার্স শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দান এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রচুর উন্নতি সাধনের প্রয়োজন লক্ষ্য করে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে যারা তাদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করতে চায় তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক আকারে সম্প্রসারণমূলক বক্তৃতামালারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

হার্টগ কমিটি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত জরিপ পরিচালনা করতে পারে নি। তবে এই স্তরের শিক্ষার মূল কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের মতামত এ রকম :

১. সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা অতিমাত্রায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। সরকারি চাকুরির জন্য ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট নিম্নতম যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারিত হওয়ায় এই পরীক্ষা সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে।

২. ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রভাব থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে মুক্ত করার জন্য নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাকে কিছুটা বহুমুখী করে বিশেষভাবে গ্রামীণ বিভিন্ন পেশার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা প্রয়োজন; সেই সঙ্গে নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমুখী শিক্ষার জন্য শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ স্কুল স্থাপন প্রয়োজন।

৩. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের আরো ব্যাপক হারে প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের চাকুরির শর্তাবলী উন্নত করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষা দানের মান ক্রমাগত উন্নয়নের স্বার্থে তাদের জন্য নানা ধরনের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্ব আরোপ বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে বাংলা ও বিহারে শিক্ষকদের বেতনের হার এত কম যে, তাদের কাছ থেকে উচ্চ মানের শিক্ষাদান আশা করাও দুরূহ।

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায় এবং এক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে অনেকগুলো সুপারিশ করে। এই কমিটির মতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা মূলত একটি গ্রামীণ সমস্যা। শহর এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থাও ভাল। তাছাড়া বাবা-মার দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রক্ষণশীলতা প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পথে বিরাট বাধা হয়ে আছে।

কমিটি দেখতে পায় যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগের ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় বিপুল অপচয় ঘটছে। ১৯২২-২৩ সালে যেসব শিশু প্রথম শ্রেণীতে পড়ত

১৯২৬-২৭ সালে তাদের মাত্র ১৮ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠে। বিদ্যালয় ত্যাগ এবং একই শ্রেণীতে একাধিক বছর পড়ে থাকা এই অপচয়ের কারণ। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন অপর্যাপ্ত, তেমনি নিরক্ষরদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন সংগঠিত উদ্যোগ নেই। বাংলায় ৭৬ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলেই শিক্ষক মাত্র একজন (তিনটি শ্রেণী থাকলেও); একারণে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা অতি সামান্য। আবার যারা ভর্তি হয় তারাও অল্প দিন পরই স্কুল ছেড়ে যায়। স্কুলের শিক্ষাক্রম যেমন গ্রামের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন, তেমনি শিক্ষকরাও প্রশিক্ষণবিহীন (বঙ্গদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের হার মাত্র ২৫ শতাংশ)। তাছাড়া বাংলাদেশে গড়ে ১৭৭টি স্কুলের জন্য পরিদর্শক মাত্র একজন।

হার্টগ কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের উন্নতি সাধনের ওপর জোর দেয়; তাঁদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য শুধু সাক্ষরতা অর্জন নয়, মূলত গ্রামীণ জীবনের মান উন্নয়ন। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নতম শ্রেণীর শিশুদের দিকেই বেশি করে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেননা এই পর্যায়েই সবচেয়ে বেশি স্থবিরতা ও অপচয় দেখা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু একটি জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়, এর পুরো দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে না দিয়ে সরকারের আরো বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটিয়ে এবং শিক্ষার মানের যথেষ্ট উন্নতি না করে এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন সমীচীন হবে না। এই কমিটির রিপোর্ট সরকারি মহলে অভিনন্দিত হলেও বেসরকারি মহল—যারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ওপর জোর দিচ্ছিলেন—এর সমালোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, দেশে সাক্ষরতার হার যেখানে মাত্র ৮ শতাংশ সেখানে সাক্ষরতা বিস্তারের ওপরই আগে জোর দেওয়া দরকার; শিক্ষার মানের প্রশ্ন পরে বিবেচনা করা যাবে।

জাতীয় ধারা ও যুদ্ধোত্তর প্রকল্প

আগেই বলা হয়েছে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে বাংলাদেশে জাতীয় চেতনা প্রবল হয়ে উঠছিল। বিশ শতকের শুরুতে এই ধারা বিশেষ বেগ লাভ করে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। ইংরেজবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব এসব উদ্যোগে আরো উৎসাহ যোগায়। এই জাতীয় ধারায় আলীগড়ে (পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত, ১৯২৫) জামীয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া (জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় (১৯০১) ও পরে বিশ্বভারতী (১৯২১) প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এসব জাতীয় ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি হল ভারতীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থা, দেশাত্মবোধক শিক্ষা, ইংরেজের অনুকরণপ্রিয়তা বর্জন, দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দান। মহাত্মা

গান্ধী ১৯২১ সালে এ বিষয়ে কিছু নীতিমালা ঘোষণা করেন যেগুলো পরে বুনিয়াদি শিক্ষার ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত হয়।

বিশ শতকের শুরুতে দেশে যে প্রবল জাতীয় শিক্ষার ধারা সৃষ্টি হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-কে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে গণ্য করা যায়। তিনি প্রথমে বোলপুরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে এখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এ দু'টি প্রতিষ্ঠান তাঁর দীর্ঘদিনের উপলব্ধির ফলে গঠিত জীবনচেতনা ও শিক্ষাদর্শনেরই প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথ The Religion of Man (১৯৩১) গ্রন্থের "A Poet's School" শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষাদর্শনের সারমর্মটি তুলে ধরেছেন এভাবে : "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের গোড়ার কথা হল শিক্ষা কেবল মেধার বিকাশ সাধন নয়, হৃদয়ের বিকাশ সাধনও বটে। মানুষের সামগ্রিক সত্তার বিকাশ সাধনের সঙ্গে রয়েছে তার গভীর যোগ। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে রাখা। সুদৃঢ় ইচ্ছাই মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করে—তাকে শ্রেয়োময় গৌরবের পথে চালিত করে। এই যে মানুষের মনে একটা সুমহান গৌরব বোধ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—একমাত্র সুশিক্ষার দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে। তাঁর মতে সুশিক্ষার লক্ষণ হল "তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি, তাহা সম্পূর্ণভাবে হইব—ইহাই শিক্ষার ফল।" স্বদেশী ভাষা, গ্রামীণ জীবন, বিশ্বপ্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ চিন্তা ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূল ভিত্তি।

বিশ্বভারতীয় দ্বার গোড়া থেকেই উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল সকল জাতির সকল শিক্ষার্থীর জন্য। এখানকার আবাসিক ভবনগুলোতে শিক্ষার্থী আসতে লাগল যেমন ভারতের নানা অঞ্চল থেকে, তেমনি এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দূর দেশ থেকেও। এখানে মিলিত হতে লাগলেন নানা দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণীজন। বিশ্বের নানা ভাষা এখানে মর্যাদা লাভ করল। 'চীনাভবন'-এ সংগৃহীত হল চীনা ভাষায় লক্ষাধিক বই। 'কলাভবন' হয়ে উঠল ভারতীয় শিল্পকলার একটি মহাপীঠস্থান। 'বিদ্যাভবন'-এ শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা হল সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, আরবি, ফার্সি, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি নানা ভাষা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে। 'শিক্ষাভবন' হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ, 'সঙ্গীতভবন'-এ হল সংগীত ও নৃত্যকলা চর্চার ব্যবস্থা। বোলপুর সংলগ্ন সুরুল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হল 'শ্রীনিকেতন'; সেখানে ব্যবস্থা করা হল কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার। কৃষি, গোপালন, তাঁত বোনা, কাপড় ছাপানো, চামড়ার কাজ প্রভৃতি হাতে-কলমে শিক্ষার

ব্যবস্থা করা হল তাতে। 'শিল্পভবন'-এ স্থানীয় কুটির শিল্প প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হল। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ১৯৯৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা স্যার জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি যুদ্ধোত্তরকালে শিক্ষা উন্নয়নের একটি প্রকল্প তৈরি করে; এটি সাধারণভাবে সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল তৎকালীন ইংল্যান্ডে শিক্ষার যে মান অন্তত চার দশক পর ভারত যেন সে স্তর অর্জন করতে পারে। এই রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে জোর দেওয়া হল বুনিয়াদি শিক্ষার ওপর; সে শিক্ষার একটি ভিত্তি হবে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। বুনিয়াদি শিক্ষায় থাকবে দু'টি স্তর : ৬-১১ বছর বয়সীদের জন্য ৫ বছরের প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদি স্তর; আর ১১-১৪ বছর বয়সীদের জন্য তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চবুনিয়াদি স্তর। বলা হল ছ' থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন শিক্ষা জাতি গঠনের ভিত্তি রচনা করবে।

এই পরিকল্পনায় ১১-১৭ বয়ঃক্রমের জন্য ছ'বছর মেয়াদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তাব করা হল। ধরা হল যে, ১১ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়ের মধ্যে মোটামুটি ২০ শতাংশ এই স্তরে যোগ দেবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক হবে না, তবে মেধাবী ছেলেমেয়েদের জন্য দারিদ্র্য যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেজন্য ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে ছাত্র বেতন মকুব করা বা এধরনের অন্য সুবিধে দেওয়া হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ না হয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হবে। এজন্য দু'ধরনের মাধ্যমিক স্কুল থাকবে: সাধারণ স্কুল ও কারিগরি স্কুল। দু'ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই কতকগুলো 'মৌল' বিষয় থাকবে; তবে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রধানত কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে আর কারিগরি বিদ্যালয়ে প্রধানত ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। চিত্রকলা ও সঙ্গীত সবারই শিক্ষণীয় বিষয় হবে এবং মেয়েদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়টি নিতে হবে। সব মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, তবে ইংরেজি বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হবে। এছাড়া গণিত, বিজ্ঞান ও শরীরচর্চা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামগ্রিকভাবে দেশের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোন দেশে এত বেশি শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় না। ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলো মাধ্যমিক স্তরের অংশ হয়েও কলেজের সঙ্গে যুক্ত—এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের একটি শ্রেণী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং আরেকটি কলেজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সার্জেন্ট রিপোর্টে দেশের সব নাগরিকের জন্য একই ধারার শিক্ষা প্রবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শুধু অবৈতনিক হবে না, দুপুরের খাবার,

বই, বৃত্তি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে। মাধ্যমিক স্তরে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য সকল স্তরে বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এই রিপোর্টে উল্লিখিত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন তার পরে পাকিস্তান যুগে শুধু নয়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হিসেবে থেকেছে।

ঔপনিবেশিকতা কাটিয়ে ওঠা

গোড়ার দিকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। বিদ্যাচর্চার প্রতি যে ঐতিহ্যগত অনুরাগ এদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রকাশ পেয়েছিল তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নানা ধারার শিক্ষা কর্মসূচি যুক্ত হয়েছে। তার ফলে কালক্রমে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ত্রিমুখী ধারার উদ্ভব ঘটেছে : সাধারণ শিক্ষার ধারা, প্রাচীনপন্থী ধর্মভিত্তিক শিক্ষার ধারা এবং উগ্র পাশ্চাত্য-ঘেঁষা ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার ধারা। এই তিনটি ধারার ওপরই দু'শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসনের ছাপ পড়েছে। তার ফলে শুধু যে সাধারণ শিক্ষার ধারা পাশ্চাত্য শিক্ষার ধাঁচে গড়ে উঠেছে তা নয়, ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাতেও কিছুটা ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। অবশ্য তার ফলে এ শিক্ষা আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী হয়ে ওঠে নি, বরং এই শতাব্দীর শুরুতেই মাদ্রাসা শিক্ষা বর্তমান যুগের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে একথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার তৃতীয় যে ধারা তা প্রধানত মুষ্টিমেয় 'এলিট' সৃষ্টির জন্য বিদেশি ধাঁচে গড়ে উঠেছে।

এদেশের ঐতিহ্যগত শিক্ষাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার আধুনিকতাকে যুক্ত করে একটি জাতীয় শিক্ষার ধারা বিকাশের যে উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গ্রহণ করেছিলেন তা সমগ্র দেশে বা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপ্ত হতে পারে নি। তার ফলে এদেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সাধারণ মানুষের জীবন থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন এবং এই শিক্ষায় শিক্ষিতরা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে পড়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতি, পরিবেশ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশের চেয়ে তত্ত্বগত শিক্ষা ও যান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতার ওপরই বেশি জোর পড়েছে। সেই ধারা এদেশে আজো চলে আসছে এবং ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা প্রকট হয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার দিকটি কালক্রমে আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় রুগ্নতায় পরিণত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালের অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. **সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার:** ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন পাস হবার পর থেকে এদেশের বিভিন্ন শিক্ষা

কমিশন আট বছরের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন করতে থাকে। ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন থেকে প্রায় সব কমিশনই এর সপক্ষে যুক্তি রেখেছে। কিন্তু ১৯১০-১২ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে (১৮৬৬-১৯১৫) বারবার এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও তখন প্রধানত ইংরেজ সদস্যদের বিরোধিতার কারণেই তা আইনে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। অবশেষে বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৯১৯ সালে পৌর এলাকায় এবং ১৯৩০ সালে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন পাস হয়। কিন্তু অর্থ বরাদ্দের অভাবে এসব আইন বাস্তবায়নের জন্য কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় নি।

২. শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য : ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রধানত সমাজের এলিট শ্রেণীর সন্তানদের জন্য, বিশেষ করে সরকারি বিদ্যালয়গুলো স্পষ্টতই এই এলিট সৃষ্টির লক্ষ্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে। দেশের সাধারণ নাগরিকদের জন্য গড়ে ওঠে সাধারণ স্কুল-কলেজ, আর অভিজাত শ্রেণীর সন্তানদের জন্য গড়ে ওঠে ইংরেজি-মাধ্যম বা ইংরেজি-ঘেঁষা কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি ধরনের বিদ্যালয়। আরেক ধারা হল প্রধানত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রাচীনপন্থী মাদ্রাসা শিক্ষার ধারা। এই ত্রিমুখী শিক্ষার ধারা আজও দেশে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনা সৃষ্টির পথে বিপুল প্রতিবন্ধকতা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

৩. শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা : ইংরেজ রাজত্বে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে প্রায় এক শ' বছর ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজির ছিল একাধিপত্য। তারপর ত্রিশের দশকের শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে মাতৃভাষার দাবি স্বীকৃতি লাভ করে। দেশবিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে ভাষার সমস্যা জটিল রূপ নেয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের সময় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে প্রবল ইংরেজি প্রীতি গড়ে ওঠে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও এদেশের শাসক শ্রেণীর মধ্যে আজো তা প্রবলভাবে উপস্থিত; আর সে কারণেই শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা প্রবর্তনের উদ্যোগ তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারছে না।

৪. দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন : এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই সরকার শুধু আদর্শ হিসেবে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। অনুমোদিত বেসকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ দেবার জন্য অনুদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই অনুদানের জন্যই প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও তদারকি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনুপাতে পরিদর্শন ও প্রশাসন

কর্মকর্তার সংখ্যা চিরকালই থেকেছে অতি নগণ্য। এধরনের দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যাগত বিস্তার যতটা ঘটেছে, গুণগত উন্নতি ততটা হয় নি। দেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানেরও কোন সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

৫. শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান: কোম্পানির আমলে সারা ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের জন্য মাত্র এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। এ খাতে সরকারি অর্থব্যয় কম রাখার জন্য বরাবরই বেসরকারি উদ্যোগকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। যেমন ইংরেজ আমলে তেমনি পরবর্তীকালে শুধু যে বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কম রাখা হয়েছে তা নয়, কোন দুর্যোগের কারণে ব্যয় সংকোচের প্রয়োজন দেখা দিলে শিক্ষা খাতের ওপর খড়্গ এসেছে সবার আগে।

ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি কিছুটা—কিন্তু সে অগ্রগতি সন্তোষজনক তো নয়ই, বরং বেশ হতাশাব্যঞ্জকই বলতে হবে। আর শিক্ষাক্ষেত্রের এই পশ্চাদ্‌পদতা আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে। আর তাই 'রাশিয়ার চিঠি'-তে (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে : 'ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে শিক্ষার অভাবকে।'

কিন্তু বিদেশি ইংরেজ শাসকদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না দেশের প্রয়োজন মেটাবার মতো একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। সেজন্য এক আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যে সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছিল এদেশের ওপর তার প্রভাব ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার অর্ধশতক পরও আমাদের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

অসম অর্থনীতি : অসম শিক্ষা

এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা বলা হত সেখানে কখনো সূর্য অস্ত যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকলে কাবু হয়ে আর এ উপমহাদেশে প্রবল স্বাধীনতার আন্দোলন ঠেকাতে না পেরে ইংরেজদের অবশেষে এখানকার দু'শ' বছরের পাট গোটাতে হল। ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ ভাগ হয়ে ভারতের অংশে পড়ল পশ্চিম বঙ্গ আর পাকিস্তানের অংশে পূর্ববঙ্গ (১৯৫৬ সালে নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান) প্রদেশ। পাকিস্তানের দাবী প্রথমত ওঠে ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মবিকাশের সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে। ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তাতে ভারতের মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোর স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল তাতে একই রাষ্ট্রের দু' অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান রইল হাজার মাইলের ওপর। তার চেয়েও বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল দু' এলাকার ভিন্ন অর্থনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে প্রথম যে আদমশুমারি হয় সে অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ, আর পশ্চিমাঞ্চলের ৪৬ শতাংশ। পূর্বাঞ্চলের জনগণের ভাষা মূলত বাংলা, পশ্চিমাঞ্চলে মূলত সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বালুচি, পশতু এবং ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে উর্দু। দেশের দুই অংশই ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। পূর্বাঞ্চলের নদীবহুল বদ্বীপে প্রধান উৎপন্ন ছিল ধান আর পাট; পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ সেচনির্ভর অর্থনীতিতে প্রধান উৎপন্ন ছিল গম, তুলা আর ধান। দেশের দুই অংশের কোথাও তেমন কোন শিল্প ছিল না। কিন্তু দেশের রাজধানী ছিল

পশ্চিম অংশে এবং রাজনীতিতে তাদেরই ছিল প্রাধান্য; ফলে পূর্ববঙ্গকে শোষণের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে।

বৈষম্যের অর্থনীতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুদিন পরই কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পূর্ববঙ্গের পাটের চাহিদা বেড়ে যায়। তাতে যে অতিরিক্ত মুনাফা হয় তা প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানী বড় ব্যবসায়ীদের স্ফীত করে তোলে। এধরনের মুনাফা এবং দেশের দু'অংশের মধ্যে অসম বাণিজ্যের ফলে যে বাড়তি পুঁজি জমে ওঠে তা পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা সে অঞ্চলে শিল্প স্থাপন কাজে লাগায়। সেই সঙ্গে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় তারও সিংহভাগ দেশের পশ্চিম অংশে ব্যয় করা হয়। দেশবিভাগের সময় থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন শ' কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।

সারণি ২ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়ন ব্যয়ে বৈষম্য: ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫

কোটির অঙ্কে বার্ষিক গড়

সময়কাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মোট উন্নয়ন ব্যয়	পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)
১৯৫৫-৬০	২২.৯	৭৯.৫	১০২.৪	২২.২
১৯৬০-৬৫	১২৫.১	১৫৩.৯	২৭৯.০	৪৪.৮

সূত্র: Robinson, E A G and Kidron, Michael (eds), *Economic Development in South Asia*, Macmillan & Co. Ltd., 1970, p. 70

পাকিস্তানের প্রথম পরিকল্পনাকালে (১৯৫৫-৬০) দেশে যে উন্নয়ন ব্যয় হয় তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়ে বার্ষিক ৭৯.৫ কোটি টাকা আর পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে মাত্র ২২.৯ কোটি অর্থাৎ মোট ১০২.৪ কোটির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান পায় মাত্র ২২.২ শতাংশ। দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনাকালে (১৯৬০-৬৫) এই হার কিছুটা বাড়ে; কিন্তু তখনও পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৪৪.৮ শতাংশ। এসব হিসেবে সিন্ধু উপত্যকা প্রকল্প প্রভৃতি বড় কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় নি। সরকারি ব্যয় ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগও এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে আড়াই থেকে তিনগুণ বেশি হয়েছে।

দেশের দু'অংশের মধ্যে যে কৃত্রিম মূল্যসূচক বজায় রাখা হয়েছিল তাতে একই জিনিসের দামে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অনেক পার্থক্য হত। পাকিস্তানের দ্বিতীয় পাঁচ-সালা

পরিকল্পনাতে বলা হয়েছে: "একই রকম জিনিসের দাম সাধারণত পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বেশি; পরিবহন ও বিতরণের ব্যয় যোগ করে যে দাম হওয়া উচিত তার চেয়েও এই পার্থক্য প্রায়শ ঢের বেশি।" (পৃ. ৫৯) কাজেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে উন্নয়ন ব্যয়ের যে আপাতপার্থক্য দেখা যায় তার চেয়ে প্রকৃত পার্থক্য অনেক বেশি হত। এধরনের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে স্বভাবতই দেশে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তার কিছু নমুনা সারণি ৩ থেকে পাওয়া যাবে।

সারণি ৩ : পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মোট প্রাদেশিক আয় ও মাথাপিছু আয়ে তারতম্য

(১৯৫৯-৬০ সালের স্থির মূল্যে)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান		বৈষম্যের সূচক
	মোট প্রাদেশিক আয় (কোটি টাকা)	প্রাদেশিক মাথাপিছু আয়	মোট প্রাদেশিক আয় (কোটি টাকা)	প্রাদেশিক মাথাপিছু আয়	(দু' প্রদেশের মাথাপিছু আয়ের অনুপাত)
১৯৪৯-৫০	১,২৩৭	২৯৩	১,২০৯	৩৪২	১.১৬
১৯৫৪-৫৫	১,৩৮২	২৯০	১,৪১১	৩৫৪	১.২২
১৯৫৯-৬০	১,৪৯৭	২৭৮	১,৬৪৭	৩৬৬	১.৩১
১৯৬৪-৬৫	১,৮৬২	৩০১	২,২৪৪	৪৪৩	১.৪৭
১৯৬৯-৭০	২,২৭১	৩২১	৩,১৫৬	৫৪৬	১.৭০

সূত্র: Government of Pakistan, *Pakistan Economic Survey*, 1969-70

এই সারণি থেকে দেখা যাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট প্রাদেশিক আয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে সামান্য বেশি ছিল; অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হবার কারণে সেখানকার প্রাদেশিক মাথা পিছু আয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে কম। কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট প্রাদেশিক আয় পূর্ব পাকিস্তানকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। তার পর থেকে ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত দেশের দু' অংশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত অব্যাহত ধারায় বেড়েই চলেছে। ১৯৪৯-৫০ সালে যেখানে দু' অংশের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অনুপাত ছিল ১.১৬ সেটা ১৯৬৯-৭০ সালে হয়ে দাঁড়ায় ১.৭০। স্বভাবতই এধরনের বৈষম্য ও অর্থনৈতিক শোষণ ক্রমে ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ, বিশেষ করে এখানকার ছাত্রসমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই শোষণের প্রতিক্রিয়া যে স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রেও পড়েছে তার কিছুটা প্রতিফলন সারণি ৪-এ দেখা যাবে। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে গিয়েছে, অথচ এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় চারগুণ। দেশের পূর্ব-পশ্চিম দুই অংশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়েছে যথাক্রমে দেড়গুণ ও চারগুণ। দেশ বিভাগের সময় মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি স্তরেই পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিল; কিন্তু দু'দশকের বৈষম্যের নীতির ফলে সত্তরের দশকের শেষে অবস্থা ঠিক তার উল্টো হয়ে দাঁড়ায়।

পাকিস্তানী ভাবধারা প্রবর্তন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পর, বিশেষত পূর্ববঙ্গে একটি নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনেক জটিল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তবু তার মধ্যেও নানা মহল থেকে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী উঠতে থাকে। পাকিস্তান যেহেতু মূলত একটি ইসলাম-ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে, কাজেই এখানে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী ধারা প্রবর্তনের প্রসঙ্গ স্বভাবতই ওঠে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী ধারা প্রবর্তন মোটেই সহজসাধ্য হল না।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার করাচিতে ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। নতুন এলিট সৃষ্টির গালভরা ঘোষণা দিয়ে ("To create an elite that will determine the quality of a new civilisation") যে সম্মেলন শুরু হয় তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, 'পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে, তবে তার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায়নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।' স্কুল পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়াবার এবং স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হল। আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, অবিলম্বে দেশে ৬-১১ বছর বয়স্ক সব ছেলেমেয়ের জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং ক্রমে ক্রমে তা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। শেষের এই কাগুজে সিদ্ধান্ত সিকি শতকের সমগ্র পাকিস্তান কালেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নি।

পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ সালে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ-কে সভাপতি করে ১৭-সদস্যবিশিষ্ট 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি' গঠন করলেন; কমিটি তিন বছর পর ১৯৫২ সালে তার রিপোর্ট পেশ করে। এই কমিটিও সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করল। কিন্তু কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় সে সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেল না। তবে ১৯৫২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার সময়কাল চার বছর থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়। সেই সঙ্গে কমিটি মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ও আরবি বা উর্দু

বাধ্যতামূলকভাবে এবং একটি বা দু'টি বিদেশি ভাষা ঐচ্ছিকভাবে পড়ার সুপারিশ করে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দু'টি বড় সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে। একটি হল ভাষার প্রশ্ন, আরেকটি সাধারণ শিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয়ের প্রশ্ন। ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলন দু' অংশের জনগণের একক সাধারণ ভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তা পূর্ববঙ্গের জনগণ, বিশেষ করে ছাত্র সমাজ সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এসে প্রথমে রমনা ময়দানের জনসভায়, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বেশ জোর দিয়ে বললেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, আর কোন ভাষা নয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গে যে তীব্র গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে ১৯৫২-র ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলা ও উর্দু উভয়কেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। কিন্তু তার পরও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা ভেতরে ভেতরে বাংলা ভাষার পাকিস্তানীকরণের উদ্যোগ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

ভাষা সমস্যার মতোই মাদ্রাসাগুলো পাকিস্তানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে বলে অনেকে মনে করছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সনাতন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা যে বর্তমান যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেটাও দীর্ঘকাল থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাছাড়া দেশের ইংরেজি শিক্ষিত অংশ ও মাদ্রাসা শিক্ষিত অংশের মধ্যে ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য স্থাপন দুঃসাধ্য বলে গণ্য হল। এসব কারণে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটির সুপারিশে মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাক্রমকে সাধারণ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে সভাপতি করে একটি 'পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশন সে বছরই তার রিপোর্ট প্রকাশ করে। সে রিপোর্টেও ৬-১১ বয়ঃক্রমের সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন তদারক করার জন্য জেলা স্কুল বোর্ডের পরিবর্তে মহকুমা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই রিপোর্টে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার ওপর জোর দেবার এবং সাধারণ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোকে এক পর্যায়ে আনার প্রস্তাব করা হয়।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইউব খানের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর পরই ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাসচিব এস. এম. শরীফের নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। কমিশন শিক্ষার সকল পর্যায়

সারণি ৪ : পাকিস্তানের দু'অংশে শিক্ষার অসম বিস্তার : ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৫-৬৬

স্তর ও সন	পূর্ব পাকিস্তান			পশ্চিম পাকিস্তান		
	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থী	সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রতিষ্ঠান	শিক্ষার্থী	সরকারি ব্যয় (কোটি টাকা)
প্রাথমিক		(লাখ)			(লাখ)	
১৯৪৭-৪৮	২৯,৬৩৩	২৭.৬	০.৩৭	৮,৪১৩	৭.৭	১.০৯
১৯৫০-৫১	২৬,৩৫২	২৫.৪	০.৬৩	১০,৩৭৭	১০.৫	২.০৩
১৯৫৫-৫৬	২৬,২২০	২৭.৭	২.০৪	১৫,৮৪১	১৬.৯	৪.১৮
১৯৬০-৬১	২৬,৬৬৫	৩৪.২	৩.৮৩	২০,৯০৯	২০.৬	৫.৯৩
১৯৬৫-৬৬	২৭,৫৩৮	৪২.৮	৭.২৪	৩২,৯৩০	৩১.৬	১৪.৭২
মাধ্যমিক		(লাখ)			(লাখ)	
১৯৪৭-৪৮	১,৩০৩	৩.৩১১	০.২৪	৪০৮	২.০৩৭	০.৫১
১৯৫০-৫১	১,৪৫৪	৩.২৫৮	০.৫২	৫৩৯	২.৭১৪	০.৯৫
১৯৫৫-৫৬	১,৫৩৬	৩.৪৯৩	০.৬৪	৮৫৩	৪.৩৪৬	২.১১
১৯৬০-৬১	১,৭৮৮	৪.৩৮৬	২.২৯	১,১৭২	৫.৬৫৫	৩.৮৫
১৯৬৫-৬৬	২,৪২৩	৭.৯২৯	৫.৩৩	১,৬৫৮	৮.২০৫	৬.৭৩
সাধারণ কলেজ		(হাজার)			(হাজার)	
১৯৪৭-৪৮	৫০	১৮.৬	--	৪০	১৩.৫	--
১৯৫০-৫১	৬৩	১৮.১	--	৫০	২৪.৩	--
১৯৫৫-৫৬	৬৯	২৩.২	০.৩৭	৭৮	৪১.৭	০.৮১
১৯৬০-৬১	৮১	৪৭.৮	০.৭৫	১৩১	৭১.০	২.০০
১৯৬৫-৬৬	১৬১	১২৬.০	১.৭৩	২২৮	১৩৯.৩	৩.৮২
বিশ্ববিদ্যালয়						
১৯৪৭-৪৮	১	১,৬২০	০.১০	১	৬৪৪	০.১৯
১৯৫০-৫১	১	২,০৮৩	০.৩২	২	৯৬৯	০.৬২
১৯৫৫-৫৬	২	৩,৩৪৯	০.১৭	৪	২,৬৪৯	০.৬৭
১৯৬০-৬১	২	৩,৯৭০	০.৯০	৪	৫,০৮৪	০.৯১
১৯৬৫-৬৬	২	৭,০০৩	২.১৯	৪	১০,৩৪৫	৩.৫৬

তথ্যসূত্র: W M Zaki and M Sarwar Khan, *Pakistan Education Index*, Islamabad: Goverment of Pakistan, Central Bureau of Education, 1970.

বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে ৮ জানুয়ারি ১৯৬০ একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এতে বলা হয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে পাকিস্তানী জাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা। প্রাথমিক

শিক্ষার মূল লক্ষ্য হবে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দিতে হবে শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ওপর। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুকে উচ্চশিক্ষার জন্য তৈরি করা নয়, বরং জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। যেহেতু অনেক শিশুই প্রাথমিক শিক্ষার পর আর লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুযোগ পায় না, কাজেই এই স্তরের শিশুদের যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে, তেমনি তাদের কর্মজীবনে প্রবেশ করার জন্য উপযুক্ত নাগরিক হিসেবেও গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন আট-বছর মেয়াদী সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করে। তবে এই বাধ্যতা প্রবর্তিত হবে দু'পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে দশ বছর সময়ের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে, তার পরের পাঁচ বছরে এই শিক্ষা সম্প্রসারিত হবে অষ্টম শ্রেণী বা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। কমিশন প্রস্তাব করে যে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে ব্যয়ভার হবে তার অর্ধেক প্রাদেশিক সরকার বহন করবে। আর বাকি অর্ধেক স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। এছাড়া স্কুলের জন্য জমি, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণও স্থানীয় জনসাধারণকেই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

কমিশন বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও কারিগর সৃষ্টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়; তার কারণ হিসেবে বলা হয়, 'এখানেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এবং সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।' এজন্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বহুমুখী করার এবং নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গেই একটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি নিয়োগ করা হয়। তাঁরা ১৯৬০ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন এবং তা ১৯৬১ সাল থেকে চালু হয়। এই শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের স্তর ও পারিবারিক পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষাদানের সময় পাঠ্যবইয়ের ওপর বেশি নির্ভর না করে কর্মভিত্তিক শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়, শিশুদের একাধিক বছর একই শ্রেণীতে ধরে রাখা এবং পাঁচ বছর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন স্তরে স্কুল ত্যাগ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট অপচয় সৃষ্টি করছে। এজন্য অন্যান্য উন্নত দেশের মতো প্রাথমিক স্তরের শিশুদেরকে পরীক্ষা ছাড়াই বয়সের ভিত্তিতে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা

ঐতিহাসিকভাবে এদেশে মাধ্যমিক স্তরটির প্রধান ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে উচ্চ শিক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়া। সেজন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন বলল, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে গণ্য

করতে হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসেবে; তাকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় রাখা চলবে না। বলা হল মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি হিসেবে, নাগরিক হিসেবে, উৎপাদক হিসেবে ও দেশপ্রেমিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন যাতে তারা সামাজিক অগ্রগতি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উদ্ভাবন থেকে পরিপূর্ণ ফল লাভ করতে পারে এবং উৎপাদনশীল কাজে অংশীদার হতে পারে।

পাঁচ-বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার বয়ঃকাল ধরা হল ৫+ থেকে ১০+ বছর। তিন-বছর মেয়াদী নিম্নমাধ্যমিক স্তর ১০+ থেকে ১৩+ বছর, দু'বছর মেয়াদী মাধ্যমিক স্তর ১৩+ থেকে ১৫+ বছর ও দু'বছর মেয়াদী উচ্চমাধ্যমিক স্তর ১৫+ থেকে ১৭+ বছর। বলা হল বাধ্যতামূলক শিক্ষা যখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত হবে তখন নিম্নমাধ্যমিক স্তরটি প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের অঙ্গীভূত হবে। তেমনিভাবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী যা আগে উচ্চশিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হত তা এখন থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন লক্ষ্য করে যে, এদেশে মাধ্যমিক স্তরে অধিকাংশ স্কুলই বেসরকারি। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করলে ছাত্ররা কাছাকাছি অন্য স্কুলে চলে যাবে এই আশঙ্কায় স্কুলগুলো বেতন বৃদ্ধি করতে পারে না এবং তার ফলে শিক্ষকদের খুবই কম বেতন নিয়ে থাকে। এর ফলে শিক্ষার মান ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। কমিশন প্রস্তাব করল, স্কুলের মোট আয়ের ৬০ শতাংশ ছাত্রবেতন থেকে, ২০ শতাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে এবং ২০ শতাংশ সরকার থেকে আসা বাঞ্ছনীয়।

জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬০ সালে গঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি সারা দেশের জন্য একটি একীভূত শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে। তাতে মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণীর পর বহুমুখী শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করা হয় অর্থাৎ মাতৃভাষা, ইংরেজি, অঙ্ক, সমাজ পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলো বিষয় সবার জন্য আবশ্যিক এবং অন্য কতকগুলো বিষয় শিক্ষার্থীর প্রবণতা অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য মাধ্যমিক স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকলা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বহুমুখী বিভাগ চালু করা হল।

পরীক্ষাব্যবস্থা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি বিশেষ দুর্বল দিক। দীর্ঘকাল থেকে যে ধরনের রচনাধর্মী বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে মুখস্থ বিদ্যার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়; উপলব্ধি, চিন্তাশক্তির বিকাশ, প্রায়োগিক দক্ষতা এসবের ওপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এজন্য শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করল যে, ২৫ শতাংশ নম্বর নিয়মিত পাক্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে আর ৭৫ শতাংশ নম্বর শেষ পরীক্ষায় দেওয়া হবে। ১৯২১ সালে ঢাকায় যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে তার আওতা সমগ্র পূর্ববঙ্গে সম্প্রসারিত করা হয়। মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় সংখ্যা ও শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৬২-৬৩ সালে রাজশাহী, যশোহর ও

চট্টগ্রামে আরো তিনটি শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা হয়। এই চার বোর্ড চারটি বিভাগের মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের অনুমোদন ও শেষ পরীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

উচ্চশিক্ষার বিকাশ

দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের একমাত্র সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঢাকায় (১৯২১); আর এতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল দু'হাজারের কম। কিছুদিন পর রাজশাহী (১৯৫৩), ময়মনসিংহ (কৃষি, ১৯৬১), ঢাকা (প্রকৌশল, ১৯৬২), চট্টগ্রাম (১৯৬৫) ও জাহাঙ্গীরনগরে (১৯৭০) আরো পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল মূলত একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সারা বাংলায় সব কলেজ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। ১৯৪৭ সালে একটি সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ববঙ্গের সব কলেজ অধিভুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের কলেজগুলো যথাক্রমে এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট স্তরের (১১-১২ শ্রেণী) তত্ত্বাবধান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সরিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

এসব উদ্যোগ মূলত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান চাপের ফলেই নেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৪-এ পাওয়া যাবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৬০)-এ অনেক সদিচ্ছা ব্যক্ত হলেও তা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী মহলে, বিশেষ করে ছাত্র সমাজে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এসব সমালোচনার মূল কারণ ছিল দু'টি : (ক) কমিশন ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ পাস ও অনার্স দু'ক্ষেত্রেই তিন বছর করার প্রস্তাব করেছিল, একে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ শিক্ষা সংকোচন নীতির অঙ্গ বলে মনে করল; (খ) কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে অর্ডিন্যান্স জারি হয় যাকে শিক্ষক-ছাত্র মহল কালাকানুন বলে অভিহিত করে। অবশ্য ১৯৬২ সাল থেকে যে ছাত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে তার পেছনে যতটা কারণ ছিল শিক্ষাগত তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক। আইউব খানের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা ও দেশের দু' অংশের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে; শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈষম্যের যে ছাপ পড়ে তা ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সরকার ক্রমবর্ধমান ছাত্র আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে দমন করার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে 'ছাত্র সমস্যা ও ছাত্র কল্যাণ' বিষয়ক একটি চার সদস্যের কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৬৫ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে কিন্তু এটি পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য হল না। হামুদুর রহমান কমিশন মূলত আইউব খানের দমনমূলক শিক্ষানীতিরই প্রতিধ্বনি করে; তবে এতেও 'শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য' অধ্যায়ে স্বীকার করা হয়: "স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে ছিল; কিন্তু গত ২০ বছরের অবাস্তব শিক্ষানীতির ফলে সেখানকার অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটেছে। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। সরকারের একপেশে নীতিই এজন্য দায়ী . . .।"

পাকিস্তানের দু' অংশে ক্রমাগত ছাত্র বিক্ষোভ ও গণআন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালে আইউব সরকারের পতন ঘটে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান নতুন সামরিক সরকার গঠন করেন; এই সরকারের উপ-প্রধান এয়ার-মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৭০ সালে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। এই শিক্ষানীতিতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী করে তুলছিল এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে এসব সংস্কার কর্মসূচি চাপা পড়ে যায়।

জটিলতা আরো বেড়েছে

ঔপনিবেশিক যুগে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব জটিল সমস্যা জমে উঠেছিল পাকিস্তান আমলে তার সমাধান তো হলই না, বরং আরো কতকগুলো নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটল। শিক্ষার যে ত্রিমুখী ধারা ব্রিটিশ যুগে গড়ে উঠেছিল তার কোন নিরসন ঘটল না, বরং সামরিক নেতা আইউব খানের উদ্যোগে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুরূপ ক্যাডেট কলেজ পূর্ব পাকিস্তানেও প্রতিষ্ঠিত করে 'এলিট' সৃষ্টির ধারাকে আরো শক্তিশালী করা হল। এছাড়া আর যে সব সমস্যা দেখা দেয় তাদের মধ্যে রয়েছে:

১. **সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সুদূরপরাহত** : ইংরেজ রাজত্বে যেমন তেমনি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সংক্রান্ত সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর পাকিস্তানের সংবিধানে এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সর্বজনীন অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জরুরি প্রয়োজনের কথা বার বার বলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

২. **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বিস্তার :** প্রধানত এলিট সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে পাকিস্তানে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে শুধু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নয়, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যেও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়ে উঠতে থাকে। এই বৈষম্য দেখা দেয় শহর ও গ্রামে এবং পুরুষ-নারী ভেদে। গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল মোটামুটি শহরাঞ্চলের অর্ধেক, আবার মেয়েদের সাক্ষরতার হার থেকেছে পুরুষদের অর্ধেক। একই ধরনের নারী-পুরুষের বৈষম্য ছিল নানা স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও।

৩. **শিক্ষা ও জীবনের সমন্বয় :** আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের পথিকৃৎগণ জীবন ও কর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেছেন; কিন্তু নানা কারণে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও তা থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক স্তরে কর্ম-অভিজ্ঞতা সঞ্চারের কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তা তেমন সাফল্য লাভ করে নি। পাকিস্তান যুগে মাধ্যমিক স্তরে কর্ম-অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্তির নামমাত্র চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেসব চেষ্টাও প্রায় অঙ্কুরেই পরিত্যক্ত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের যেসব বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার শিক্ষার্থী সংখ্যা এত নগণ্য যে, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সেগুলোর প্রভাব পড়া শক্ত। মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষাসূচি থেকেছে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যহীন; শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বা বিশ্লেষণমুখিতা বিকাশের সঙ্গেও তাদের সঙ্গতি স্থাপন করা যায় নি।

৪. **শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় :** এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত অপচয়মূলক একথা এদেশে যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে তাঁরা সবাই তুলে ধরেছেন। অপচয়ের রূপ মূলত দু'টি : প্রথমত এক শ্রেণী থেকে পরবর্তী শ্রেণীতে ওঠার ক্ষেত্রে অপচয়। প্রাথমিক স্তরে সাধারণত এধরনের বিপুল অপচয় লক্ষ্য করা যায়— প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার সময়ই অধিকাংশ শিশু ঝরে পড়ে। বিদ্যালয়ের অনাকর্ষণীয় পরিবেশ, নীরস শিক্ষাসূচি, দুর্বল নিস্পৃহ শিক্ষাদান পদ্ধতি এসবই এর প্রধান কারণ। অপচয়ের দ্বিতীয় রূপ হল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে সচরাচর পাসের হার ৫০ শতাংশ বা তারও কম; উচ্চশিক্ষার স্তরে কখনও পাসের হার মাত্র ৩০ বা ৪০ শতাংশ। এধরনের অপচয়ের মূল কারণ শিক্ষাক্রমের অনুপযুক্ততা, দুর্বল শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক আমলে যে পুথিগত বিদ্যার প্রাধান্য গড়ে উঠেছিল তার জগদ্দল পাথর শিক্ষাব্যবস্থার ওপর চেপে রয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক অভীক্ষার ব্যবহার প্রভৃতি

যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তাতে সামগ্রিক অরাজক পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হয় নি।

৫. **শিক্ষার কাঠামো :** বাংলাদেশে ১৯৫২ সাল থেকে শিক্ষার কাঠামো মোটামুটিভাবে এরকম : প্রাথমিক ৫ বছর, মাধ্যমিক ৩+২ বছর, উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর এবং ডিগ্রি ২/৩ বছর। ১৯৫৯ সালে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (শরীফ কমিশন) প্রাথমিক স্তরকে সম্প্রসারিত করে ৮ বছর করার এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (১১-১২)-কে কলেজ থেকে সরিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ করার সুপারিশ করেছিল; তবে এক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হলে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ৬-৮ম শ্রেণী যোগ করতে হবে; সেই সঙ্গে ৬-৮ম শ্রেণীর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ১-৫ম শ্রেণী যোগ হবে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে ১১-১২শ শ্রেণী এবং বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর সঙ্গে ৯-১০ম শ্রেণী যোগ করতে হবে। এই কাঠামোগত সমস্যার আজো কোন সমাধান হয় নি।

৬. **ভাষা সমস্যা ও জাতীয়তার বিকাশ :** দেশবিভাগের পর এদেশে ভাষার সমস্যা জটিল রূপ নেয়। পূর্ববঙ্গে উর্দু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তীব্র প্রতিরোধের ফলে ব্যর্থ হয়। প্রবল গণদাবীর মুখে শিক্ষাক্ষেত্রে ও জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সহায়ক পুস্তক প্রণয়নের যে দায়িত্ব বাংলা একাডেমীর ওপর অর্পিত হয়েছিল তা অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে একাডেমীর পক্ষে পালন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার জন্য যেটুকু উদ্যোগ গৃহীত হয় তাও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বলে প্রমাণিত হয়।

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর

১৯৭১ সালে ন'মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় শুধু এদেশের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যই ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। পাকিস্তানের স্বল্পকালের ইতিহাসে দেশের দু'অংশের দুস্তর ভৌগোলিক ব্যবধান, সংস্কৃতিগত পার্থক্য এবং সেইসঙ্গে পশ্চিমী শাসকবর্গের নির্মম লুণ্ঠন ও জাতিগত শোষণের কলঙ্কজনক অধ্যায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। তবু, এদেশের জনগণের জন্য এ ঘটনার যে বিপুল তাৎপর্য তা আমাদের কাছে দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকবে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সংস্কার ও নবায়নের জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্যোগ কিছু কম নেওয়া হয় নি। স্বাধীন দেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতির জরুরি প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে একেবারে গোড়া থেকেই আর এই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে ডজনখানেক কমিশন, জাতীয় কমিটি ইত্যাদি গঠিত হয়েছে; কিন্তু সে সবের তেমন যে একটা ফল হয়েছে তা বলা যায় না।

যে সৃষ্টিতে ত্যাগ ও যন্ত্রণা যত বেশি, সেখানে মানুষের প্রত্যাশাও বুঝি তত বড় হয়ে ওঠে! বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। স্বাধীনতা অর্জন এদেশের মানুষের মনে এক বিপুল প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার কাছে সেদিন মানুষের আশা ছিল অনেক; সীমাহীন বিকাশের সম্ভাবনা সেদিন মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। দেশের নেতৃত্বের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এই নতুন রাষ্ট্রের বিকাশ ও অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল তার শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। এই উপলব্ধি থেকে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নতুন রাষ্ট্রের

শিক্ষানীতি নির্ধারণ করার জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড: মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। সেদিনের সেই কমিশন এই বড় মাপের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে বলেছিল:

> অবশেষে স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় [জনগণের] নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনার তোরণদ্বার উন্মুক্ত করেছে। এই নবজীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নিহিত সে সত্য এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এজন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। . . . আজ স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন তাই জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্বরূপে দেখা দিয়েছে। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃঃ ক)

কুদরাত-এ-খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে এদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং শিক্ষার সকল স্তর সম্বন্ধে সুপারিশ সংবলিত রিপোর্ট সরকারের কাছে ১৯৭৪ সালের ৩০ মে দাখিল করে। তারপরও শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে আরো বেশ ক'টি কমিশন, কমিটি ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এসব বিদ্বজ্জনের পরামর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের তেমন উদ্যোগ দেখা যায় নি; আর তার ফলে স্বাধীনতার সিকি শতক পর শিক্ষাক্ষেত্রে মানের অধোগতি, ব্যাপক অস্থিরতা ও অপচয় আজ সকলের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষায় এখনও পিছিয়ে

সাম্প্রতিক কালে সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষা মানুষের একটি জন্মগত অধিকার বলে আজ সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের পূর্ণরূপে মানুষ হয়ে ওঠার একটি পধান অবলম্বন হল শিক্ষা; এ কারণেই প্রাথমিক স্তরের বুনিয়াদি শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রত্যেক মানুষকে দিতে হবে—এ ধরনের নীতি সবদেশের সংবিধানের অঙ্গীভূত হচ্ছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকারের ঘোষণা, তার পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালের শিশু অধিকারের ঘোষণা এবং ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকারের সনদেও এ সত্যের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শিশু অধিকারের দলিলগুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব শিশুর জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক দশক ধরে শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অর্থনীতিবিদদের গবেষণা থেকে এ সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা শুধু যে প্রতিটি শিশুর

মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তা নয়, জনগণের বুনিয়াদি শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যও একটি পূর্বশর্ত। উনিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ এবং প্রাচ্যে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে; তাদের এ পদক্ষেপ এসব দেশের আজকের অগ্রগতির পেছনে বড় রকম অবদান রেখেছে।

আশির দশকের শেষে এসে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নকে তার কর্মসূচির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশ শতকে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটলেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে এখনও প্রায় ৯৫ কোটি বয়স্ক লোক নিরক্ষর। এই তালিকায় বাংলাদেশের নামটি একেবারে প্রথমদিকের সারিতে রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব দেশে বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তাদের মধ্যে ভারত, চীন ও পাকিস্তানের পরই বাংলাদেশের স্থান। দুনিয়া জুড়ে এই নিরক্ষর জনসংখ্যা শুধু তাদের নিজ নিজ দেশের অগ্রগতি নয়, সমগ্র পৃথিবীর অগ্রগতিকেই ব্যাহত করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯০ সালে জমতিয়েন সম্মেলনে সারা পৃথিবীতে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের এবং বয়স্ক নিরক্ষরতার হার কমিয়ে আনার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

সারণি ৫: এশিয়ার নানা দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বয়ঃক্রমভিত্তিক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

	প্রাথমিক		মাধ্যমিক		উচ্চশিক্ষা	
	১৯৭০	১৯৯২	১৯৭০	১৯৯২	১৯৮০	১৯৯২
ফিলিপাইন	১০৮	১০৯	৪৬	৭৪	২৮	২৮
ইন্দোনেশিয়া	৮০	১১৫	১৬	৩৮	৪	১০
থাইল্যান্ড	৮৩	৯৭	১৭	৩৩	১৩	১৯
শ্রীলঙ্কা	৯৯	১০৭	৪৭	৭৪	৩	৬
মালয়েশিয়া	৮৭	৯৩	৩৪	৫৮	৪	৭
ভারত	৭৩	১০২	২৬	৪৪	৬	তথ্য নেই
পাকিস্তান	৪০	৪৬	১৩	২১	৪	তথ্য নেই
নেপাল	২৬	১০২	১০	৩৬	৩	৭
বাংলাদেশ	৫৪	৭৭	তথ্য নেই	১৯	৩	৪

তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৯৫

বাংলাদেশে আমরা যে শুধু সাক্ষরতার হারেই পিছিয়ে আছি তা নয়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরেও আমাদের শিক্ষার্থীর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় একবারে নিচের

সারিতে। এমনকি এশিয়ার এই অঞ্চলে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর গত দু'দশকের শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতির তুলনা করলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা যে কত শোচনীয় তা কিছুটা স্পষ্ট হবে। সারণি ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের আশেপাশের অনেক দেশ যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রায় একই সময়ে ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল তারা এর মধ্যে আমাদের বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসব দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, অথচ আমরা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় তো বটেই, এমনকি আমাদের আশেপাশের দেশের চেয়েও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ছি। তার ফলে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রতিবেশীদের তুলনায় আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি।

অথচ ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে উপলব্ধি যে কম তা বলা যাবে না। এদেশের বিভিন্ন ধর্মে বিদ্যাশিক্ষার ওপর প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধযুগে, মধ্যযুগে বা এমনকি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে উনিশ শতকের শুরুতেও ভারতের এ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ গণশিক্ষার আয়োজন ছিল বলে জানা যায়। জন অ্যাডামের জরিপে (১৮৩৫-৩৮) সেকালের বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হদিস পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পর জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের সংবিধানে ১৯৭২ সালেই সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়:

"১৭। রাষ্ট্র

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য,

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

সেই নবস্বাধীন দেশের সরকার বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য ১৯৭২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে দেশের প্রথম শিক্ষা

কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন প্রস্তাব করে যে, দেশের জনগণকে জাতীয় কর্মে ও উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলার জন্য একটি সর্বজনীন শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। আর আজকের দিনে পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে দ্রুত প্রসার ঘটছে তাতে সুনাগরিকত্ব অর্জনের জন্য অন্তত আট বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রয়োজন। একারণে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে গণ্য করে তাকে সর্বজনীন করতে হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করলে তার সর্বজনীনতা নিশ্চিত হবে না। কমিশন প্রস্তাব করে যে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু আছে তাকে ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এক অভিন্ন ধরনের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনমতো দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য নৈশ স্কুল চালু করতে হবে।

কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই ১৯৭৩ সালে দেশের ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে (১৫৭,৭৪২ জন শিক্ষক ও ৭,৭৫৮,০০০ জন শিক্ষার্থীসহ) সরকারিকরণ করা হয়। কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসূচিকে এদেশের জনগণের জীবনধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও জীবনমুখী করার ওপরও বিশেষ জোর দেন।

মাধ্যমিক স্তর প্রসঙ্গে কমিশনের প্রধান সুপারিশ হল দেশের বাস্তব অবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও জীবনপদ্ধতি বিবেচনা করে এই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে (১৪-১৭ বছর বয়সের) প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষার্থী প্রতি বছর পড়াশোনা ত্যাগ করে, কিন্তু জীবিকা অর্জনের সহায়ক কোন শিক্ষা তারা পায় না। কাজেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। প্রান্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা মোটামুটি একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং সাধারণ শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে নবম শ্রেণী থেকে শিক্ষাক্রম মূলত দু'ভাগে বিভক্ত হবে : বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। উভয় ধারাতেই নবম ও দশম শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয় অবশ্য পাঠ্য থাকবে, এ ছাড়া অন্য কতকগুলো বিষয় শিক্ষার্থীরা স্বনির্বাচিত ধারায় বেছে নেবে। বৃত্তিমূলক ধারায় মাধ্যমিক শিক্ষা হবে তিন বছরের, সাধারণ ধারায় হবে চার বছরের।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৮০ সাল থেকে দেশব্যাপী যে 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' চালু হয়েছিল তাও ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তনের সময় বাতিল করা হয়। তবে তারপরও কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণের চাপ

বাড়তে থাকে; তার ফলে ১৯৮৭ সালে সরকার ডঃ মফিজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আরেকটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। তার রিপোর্টেও ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫-বছর মেয়াদী এবং ২০০০ সালের মধ্যে ৮-বছর মেয়াদী সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

ইতোমধ্যে ১৯৯০ সালে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ সবার জন্য শিক্ষাবিষয়ক বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে ২০০০ সালের মধ্যে সারা পৃথিবীকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ডাক দেওয়া হয়েছে। তার ফলে অবশেষে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ প্রণীত হয় এবং তা ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে আংশিক এবং তার পরের বছর থেকে সারা দেশে প্রবর্তন করা আরম্ভ হয়। আবার নতুন করে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুরও কিছুটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই বছরই (১৯৯২) 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ডিভিশন' নামে একটি নতুন ডিভিশন কাজ শুরু করে।

অগ্রগতির অসম ধারা

যে কোন দেশের শিক্ষার অগ্রগতিকে দু'ভাবে দেখা যায়। এক হল শিক্ষাব্যবস্থাকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন সেই সরকারি কর্তৃপক্ষের চোখ দিয়ে; আরেক হল এই শিক্ষাব্যবস্থার যারা ভোক্তা সেই জনগণ, বিশেষ করে তরুণ সমাজের চোখ দিয়ে। এই দু'পক্ষের চোখে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের শিক্ষার খতিয়ান নিলে হুবহু একরকম চিত্র ভেসে ওঠে না। আবার এদেশে সরকারি কর্তৃপক্ষের দেয়া ছবি প্রায়শ সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি বদলে যায়। এক সরকার বিপুল উদ্যমে সাক্ষরতা কর্মসূচি গ্রহণ করলে কিছুদিন পরই আরেক সরকার এসে তাকে অপচয়মাত্র বলে রায় দেন এবং

সারণি ৬ : বাংলাদেশে শিক্ষার নানা স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি : ১৯৭২-৯৫

স্তর	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫[১]	গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)	মোট কতগুণ বৃদ্ধি (১৯৭২-৯৫)
প্রাথমিক	৩৬,৫৩৭	৪৩,৯৩৬	৪৫,৯৩০	৬০,২৯২	২.২০%	১.৬৫
মাধ্যমিক	৭,৭১৭	৮,৪৮৫	১০,৪৪৮	১১,৭০৯	১.৮৫%	১.৫২
দাখিল মদ্রাসা	৫২৮	১,৪০২	৪,৩০৬	৪,০৫২	৯.২৬%	৭.৬৭
সাধারণ কলেজ	৫৩১	৫৮১	৮৪৮	১,১২৫	৩.৩২%	২.১২
বিশ্ববিদ্যালয়	৬	৬	৯	১৮	৪.৮৯%	৩.০০

১ ১৯৯৫ সালের তথ্য প্রাক্কলিত। প্রাথমিক স্তরের হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে গণশিক্ষার উদ্যোগ বাদ দিয়ে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে সাক্ষরতার হার পঁচিশ শতাংশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশে বাড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেন। স্পষ্টতই এ ধরনের ঘোষণার পেছনে জনকল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার লক্ষ্যই বেশি থাকে।

তবে সময়ের অমোঘ ধারায় কিছুটা সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন তো এমনিতেই ঘটে। তা থেকে এক ধরনের পরিমাণগত অগ্রগতির নজির দেখানো তেমন কঠিন নয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটির মতো। স্বাধীনতার পর প্রথম সিকি শতকে বার্ষিক প্রায় ২.৫ শতাংশ হারে বেড়ে এই জনসংখ্যা তার দু'গুণের কাছাকাছি হয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক আর মাধ্যমিক দু'স্তরেই শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে মোটামুটি দু'-আড়াই গুণ হয়েছে; কাজেই সেটাকে প্রকৃতপক্ষে তেমন কিছু তুলনামূলক অগ্রগতি বলা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে। এই দু'স্তরেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র দেড় গুণের মতো; তার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীকক্ষের ওপর চাপ বেড়েছে। তাছাড়া শিক্ষকের সংখ্যা যেহেতু সে অনুপাতে বাড়ে নি কাজেই শিক্ষকদের ওপরও চাপ বেড়েছে আগের চাইতে অনেক বেশি আর তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি ঘটেছে।

সারণি ৭ : বাংলাদেশে শিক্ষার নানা স্তরে শিক্ষার্থীসংখ্যার বৃদ্ধি : ১৯৭২-৯৫

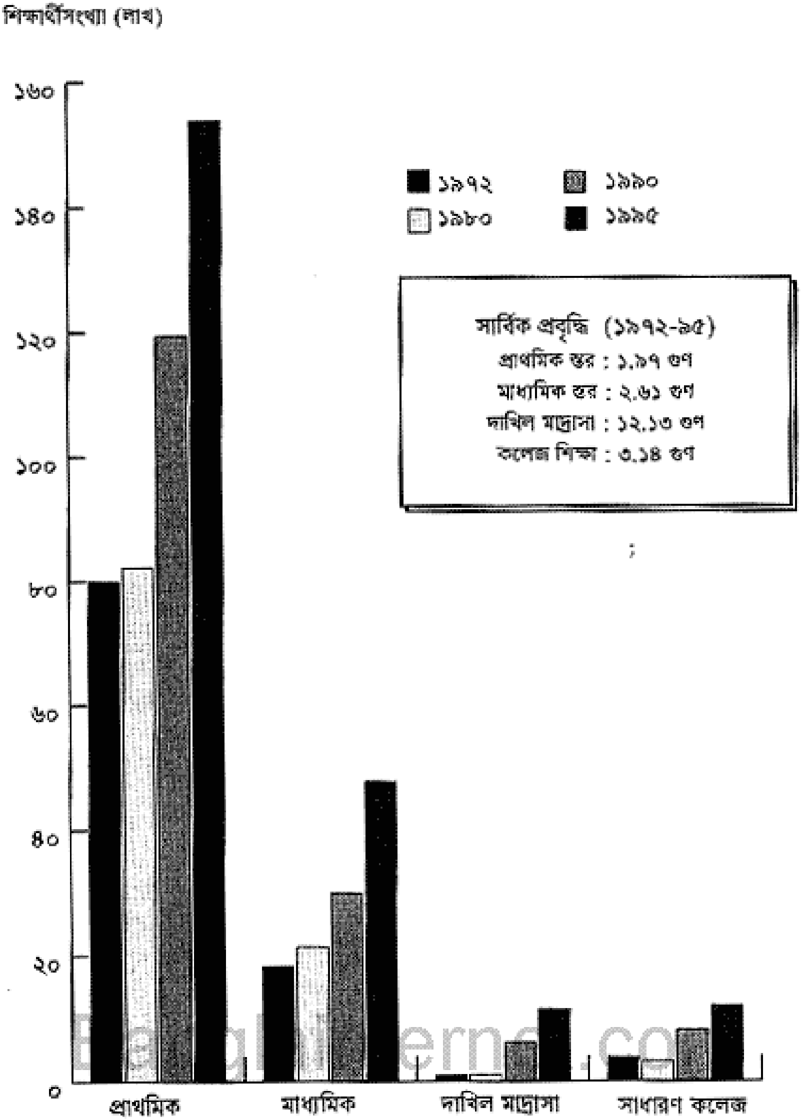
শিক্ষার্থী সংখ্যা লক্ষের অঙ্কে

স্তর	১৯৭২	১৯৮০	১৯৯০	১৯৯৫	গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)	মোট কতগুণ বৃদ্ধি (১৯৭২-৯৫)
প্রাথমিক	৭৭,৯৪	৮২,১৯	১১৯,৪০	১৫৩,৯২	৩,০০%	১,৯৭
মাধ্যমিক	১৮,৩৪	২১,৪২	২৯,৯৪	৪৭,৮৪	৪,২৬%	২,৬১
দাখিল মাদ্রাসা	০.৯৫	১.২৪	৬.১৫	১১.৫২	১১.৪৬%	১২.১৩
সাধারণ কলেজ	৩,৮৫	৩.৩৪	৮,২৪	১২.০৮	৫,১০%	৩.১৪
বিশ্ববিদ্যালয়	০.২৬	০.৩৭	০.৫২	০.৭৬	৪.৭৭%	২,৯২

তথ্যসূত্র : BANBEIS, *Bangladesh Educational Statistics*, 1974, 1985, 1991, 1994, ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

সংখ্যাগত বৃদ্ধির মোটামুটি একই ধারা দেখা যাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘকালের সুপারিশ সত্ত্বেও উচ্চমাধ্যমিক স্তরটিকে 'মাধ্যমিক'-এর শেষ ধাপ হিসেবে না ধরে কার্যত আজো উচ্চশিক্ষার স্তর হিসেবেই গণ্য করা হয়। সে

চিত্র ১ : বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীসংখ্যার বৃদ্ধি : ১৯৭২-৯৫



হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণের ওপর; শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে প্রায় তিনগুণের কাছাকাছি–স্বাধীনতার সময়ের চার লাখ থেকে বেড়ে আজ বার লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৪,০০০ থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯৯৫ সালে (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেব ধরে) ৭৬,০০০-এ পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় দেশে মাত্র ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল : ঢাকা, রাজশাহী, কৃষি, প্রকৌশল, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর। স্বাধীনতার পর পাঁচটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৫), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯১), সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯১), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২)। এছাড়া নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি (১৯৯৩) প্রভৃতি ক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীসংখ্যাও গত দু'দশকে প্রায় তিনগুণ হয়েছে।

অবশ্য সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে নাটকীয় বিস্তার ঘটেছে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে। দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত নানা পর্যায়ের মাদ্রাসার সংখ্যা ১,৪০০ থেকে বাড়তে বাড়তে ৫,৮০০-তে পৌঁছেছে; এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা চার লাখ থেকে বেড়ে সতের লাখের ওপর উঠেছে। ইবতেদায়ী পর্যায়ের ১৬,০০০ মাদ্রাসায়ও আজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা উনিশ লাখের ওপর দাঁড়িয়েছে। দাখিল স্তরে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে সাড়ে সাতগুণের ওপর আর তাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে বারগুণের ওপর (সারণি ৬,৭)।

আবার এর উল্টোপিঠে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটেছে নিতান্ত শম্বুকগতিতে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার একটি ধারা হল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা। আট বছরের সাধারণ শিক্ষার পর দু'বছর মেয়াদী ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ভি.টি.আই.) বা বৃত্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায়। সর্বশেষ (১৯৯৪) হিসেব অনুযায়ী ৫১টি ইন্সটিটিউটে প্রায় ৩,৬০০ এবং ১২টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে আরো প্রায় ৩,৬০০ শিক্ষার্থী কারিগরি পর্যায়ের বৃত্তিমূলক শিক্ষা পাচ্ছে; এসব সংখ্যা স্বাধীনতার পর মোটেই তেমন বাড়ে নি। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ১৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০-এ; কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০,০০০ থেকে বেড়ে এখনো ১৩,০০০ পেরোতে পারে নি। সব মিলিয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এক শতাংশেরও কম এদেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করে।

প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটেছে গত দু'দশকে মাত্র দেড়গুণের মতো অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে তার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে এগোতে পারে নি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এদেশে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির হার খুবই কম। অথচ এধরনের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনসম্পদ ছাড়া

আধুনিক জগতে কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটা মোটেই সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য-সুবিধা, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, আবাসনব্যবস্থা—অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান যে পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর মধ্যে, এ থেকেই সম্ভবত তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

গণসাক্ষরতা বিস্তারের দিক দিয়েও আমাদের অবস্থা তথৈবচ। সত্তরের দশকে আর আশির দশকের শুরুতে এদেশে বিদ্যুচ্ছটার মতো গণশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল; কিন্তু তার দীপ্তি অতি দ্রুত মিলিয়ে যায়। এদিকে জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ বিশ্ব সম্মেলন থেকে ডাক দিয়েছে দু'হাজার সালের মধ্যে 'সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা' নিশ্চিত করার। এই 'মৌলিক শিক্ষা' শুধু অক্ষরজ্ঞানের বা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মতো পাঁচ বছরের শিক্ষা নয়, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আট-বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। সে ধরনের সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন পরিকল্পনার কথা আমাদের দেশে আজও শোনা যাচ্ছে না।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন স্বাধীনতার সেই ঊষালগ্নে এসব সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা করে নানা সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব রেখেছিল। এসব প্রস্তাবে প্রাধান্য পেয়েছিল ১৯৮৫ সালের মধ্যে আট বছর মেয়াদী অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, কর্মমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ, ব্যাপক সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধান। এসব লক্ষ্য অর্জনের পথে আমরা মোটেই তেমন এগোতে পারি নি। শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক অরাজকতা, লক্ষ্যহীনতা ও দেশের উৎপাদনমুখী কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীনতা প্রতি মুহূর্তে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্যোগ যথেষ্ট নয়

শিক্ষা বিস্তারে এদেশে গত দেড় শ' বছরের উদ্যোগ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এযাবৎ জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট তো নয়ই, বরং অধিকাংশ সময় শিক্ষার প্রতি সুপরিকল্পিত অবহেলাই দেখতে পাওয়া যায়। আর সেজন্যই দারিদ্র্য ও পশ্চাদ্‌পদতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। দীর্ঘকাল ধরে যে শিক্ষাখাতে স্বল্প অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে সেটা এই খাতের প্রতি অমনোযোগিতারই পরিচয় দেয়।

১৯৯৫ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১৮,৬০০,০০০। গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে ২৪০ জন শিক্ষার্থী ধরলে তাদের

জন্য ৭৭,৫০০ বিদ্যালয় প্রয়োজন; এখন আছে মোটামুটি ৬০,০০০। এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়; তাই এখনই অতিরিক্ত ১৭,৫০০ বিদ্যালয় প্রয়োজন। ২০০০ সালে বিদ্যালয়-উপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা আরো বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৯,৮০০,০০০। তার জন্য আরো প্রায় ৫,০০০ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত ১:৬৫; তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচুর তারতম্য আছে। অথচ এই অনুপাত কিছুতেই ১:৪০-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। সরকারি জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৪০ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য তিনজন বা তারও কম শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। বেসরকারি বিদ্যালয়ে গড়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা চারজন। দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যা প্রায় ৬৫,০০০। ৫৪টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পি.টি.আই.) প্রতি বছর গড়ে সর্বোচ্চ ১০,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। তাতে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্যই প্রয়োজন প্রায় সাত বছর সময়। অথচ প্রতি বছর অবসর গ্রহণ প্রভৃতি কারণে প্রায় ৮,০০০ নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়। শিক্ষক আর শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে অনেক বিদ্যালয়েই আজ দুই বা তিন পালায় (শিফটে) পড়ানো হয়; কিন্তু তাতে একজন শিক্ষার্থী সারা বছরে যতটা সময় শিক্ষক বা শিক্ষিকার সাহচর্যে কাটায় তা অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে এসে দাঁড়ায়। স্পষ্টতই এতে শিক্ষার মান হয় নিম্নগামী।

সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের ভর্তির হার বেড়েছে; উভয় স্তরে মেয়ে আর ছেলের হার আজ ৪৫:৫৫ বা এর কাছাকাছি। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষিকার হার এখনও তেমন বাড়ে নি। প্রাথমিক স্তরে এই হার মাত্র ২৫ শতাংশের কাছাকাছি; মাধ্যমিক স্তরে হার এর মাত্র অর্ধেক। শিক্ষিকাদের এই স্বল্প হার মেয়েদের বিদ্যালয়ে টেনে আনার বা ধরে রাখার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। এই হার যত দ্রুত সম্ভব বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৫০ শতাংশ আর মাধ্যমিক স্তরে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠ্যবই ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অনাকর্ষণীয় হওয়াই এর প্রধান কারণ। সাম্প্রতিককালে এক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হলেও সরকারি হিসেবেই ঝরে পড়া ও পুনরাবর্তন বাদ দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০ শতাংশের মতো পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে। আবার যেসব শিক্ষার্থী পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তাদের মধ্যে মোটামুটি ৬০ শতাংশ ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়।

অথচ জাতিসংঘের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে ১৪ বছর বয়স অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে।

ঠিক এমনি শোচনীয় অবস্থা দেশে নিরক্ষর জনসংখ্যার হারের দিক থেকে। গত দু'দশকে দেশে বয়স্ক নিরক্ষরতার হার সামান্য কমলেও মোট নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আদমশুমারির তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় ১৯৯১ সালে ১৫+ বয়সের নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল চার কোটির ওপরে। গত দু'দশকে দেশে সরকারি উদ্যোগে যেসব বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে গড়ে প্রতি বছর এক লাখ লোকও সাক্ষর হয় নি; এর চেয়ে বরং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আরো বেশি নিরক্ষরকে সাক্ষরতা দেওয়া হয়েছে। এখনও এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাতে দেশের মোট বয়স্ক নিরক্ষরের শতকরা দু'ভাগের বেশি প্রতি বছর সাক্ষর করা সম্ভব হবে না। স্পষ্টতই বর্তমান উদ্যোগকে আরো বহুগুণে বাড়ানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশের উদ্ভবকালে এদেশে মোটামুটি চারজনে একজন বয়স্ক ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। আজ দু'দশক পর এই হার বেড়ে শতকরা ৩৬ অর্থাৎ তিনজনে একজনের মতো দাঁড়িয়েছে। তবে এই অগ্রগতিও সমগ্র জনসমাজে মোটেই সুষম নয়; শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষ ইত্যাদি নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার কিছুটা বাড়লেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার এখনও মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ।

আসলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আজ দু'দশক পর সে সবের চরিত্র খুব একটা বদলায় নি। শুধু সময়ের ব্যবধানে আর দীর্ঘকালের অমনোযোগ ও অবহেলার ফলে এসব সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই আরো জটিল রূপ নিয়েছে।

দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের দুর্গতি চলছে এটা আজ অতি স্পষ্ট। সরকার যেসব কর্মসূচি নিয়েছেন তাতে ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে যাবার উপযোগী সব ছেলেমেয়েকে স্কুলে নেবার কথা। তাঁদের হিসেবে ছ' থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ৯৫ জনকে ২০০০ সালের মধ্যে স্কুলে নেওয়া হবে এবং সেজন্য এর মধ্যেই নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারিভাবে আমাদের অর্থনীতিতে যেমন তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতির কথা বলা হচ্ছে। যেমন বলা হচ্ছে, আমাদের বিদেশ-নির্ভরতা এখন কিছুটা কমেছে, মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বেড়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কিছুটা কমেছে। স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার, উপস্থিতির হার বেড়েছে—এমন কথাও বলা হচ্ছে। কিন্তু ইউনিসেফের উদ্যোগে

জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, জেলায় ৬ থেকে ১০ বছরের গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রায় ৯১.৬% ছেলে এবং প্রায় ৯২.৫% মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, সেখানেও মাত্র ৫৪% ছেলেকে আর ৪৯% মেয়েকে স্কুলে পাওয়া গেছে। অধিকাংশ জায়গায় উপস্থিতির হার ৫০% শতাংশের বেশি নয়। এই যদি হয় এগোবার লক্ষণ তাহলে শিক্ষা খুব যে এগোচ্ছে তা বলা শক্ত। মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার তো এখনও সরকারিভাবেও বয়ঃক্রমের ২৬ শতাংশের ওপরে তোলা যায় নি।

সরকারি মহল থেকে শিক্ষার জন্য বহু হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়ে থাকে। দেশের মোট বাজেটের ১৫% ভাগ এবং মোট জাতীয় আয়ের ২%-র কাছাকাছি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু গবেষণার জন্য আমাদের দেশে কোন বরাদ্দ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন অনুদান বা পৃষ্ঠপোষকতা পান না বলে গবেষণা করতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে অভিযোগ প্রচুর। এটা বহুল প্রচারিত যে, এদেশে উচ্চশিক্ষার মান তেমন উঁচু নয়, বরং ক্রমশ তা নিম্নগামী। শিক্ষাঙ্গনে প্রায়শ ঘটছে হিংসাত্মক হানাহানি। তার ফলে অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রছাত্রী শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এটা কোন দেশের জন্যই গৌরবের কথা নয়। তাছাড়া আগামী দিনে দেশের অগ্রগতির জন্য যে মেধাশক্তির প্রয়োজন হবে তাও আমরা সৃষ্টি করতে বা ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি।

আজকে সবার জন্য শিক্ষার যে কথা বলা হচ্ছে—তা শিশুদের জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি বয়স্কদের জন্যও প্রয়োজন। যেমন পুরুষদের জন্য তেমনি নারীদের জন্যও প্রয়োজন। স্পষ্টতই জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবক্ষয়ের ছাপ আজ স্পষ্ট তার হাত থেকে মুক্তিলাভের সামগ্রিক উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী রূপান্তর ঘটানো জরুরি হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজ রাজনৈতিক হানাহানির কেন্দ্র। বিদ্যার গলাধঃকরণ এবং যেনতেন প্রকারে পরীক্ষার পুলসেরাত পেরনো আজ প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের স্থান দখল করেছে। স্বচ্ছ মুক্তচিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, অনুধাবন ও প্রয়োগ, সৃজনশীলতা এসব গুণ আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় যেন দুয়োরানীর আসনে। এমনি ছাঁচে-ঢালা দায়সারা গোছের শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে একুশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর উপযোগী মানুষ তৈরি আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না।

শিক্ষাক্রমের সমস্যা

শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্গতি শুধু পরিমাণগত বিস্তারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলে তবু কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত। যে ব্যর্থতা আমাদের শিক্ষার পরিসংখ্যানে, বোধকরি তার চেয়েও বড় ব্যর্থতা এই শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়নে। তার ফলে যারা আজ এই

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে উঠছে তারাও আধুনিক জগতের জন্য কতটা প্রস্তুত হচ্ছে সে প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে।

শিক্ষা তো শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিয়ে বিচার করা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা হল বিভিন্ন স্তরে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে; কিভাবে শেখানো হচ্ছে, সে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা কতখানি গ্রহণ করতে পারছে; যতটা তারা গ্রহণ করছে তাতে সমাজের ওপর কতখানি কল্যাণকর প্রভাব পড়ছে। এসবের বিচার তুলাদণ্ডে বা মাপকাঠি দিয়ে করা শক্ত; কিন্তু তবু এ বিচার ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতির বিবেচনা অর্থহীন থেকে যায়।

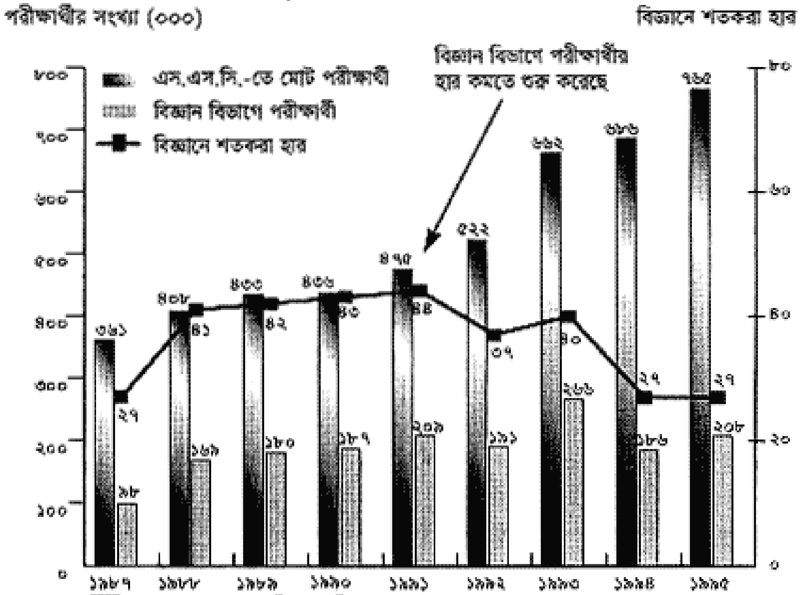
কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক রূপান্তরের সুপারিশ করে তার ফলে স্বভাবতই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য যুগোপযোগী নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছিল :

> "বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে যে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সময়ের পরিবর্তন ও মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্রুত সমৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল রূপান্তর ঘটছে, আমাদের দেশ এখনও তার প্রভাব থেকে যেন বাইরে রয়েছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছিল, সামান্য রদবদল করে মোটামুটিভাবে তাই আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে চালু রাখা হয়েছে। এ ধরনের রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী, গতানুগতিক ও নিম্নমানের উপকরণ একটি প্রগতিশীল দেশের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ মানের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে না।" (রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃঃ ২১৩)

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে কুদরাত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। তবে নতুন একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন না এনেও কোন উপায় ছিল না। তাই অনেকটা খণ্ডিতভাবে ১৯৭৫ সালে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৮ সালের জুন পর্যন্ত কাজ করে সাতখণ্ডে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন সম্পন্ন করে। এগুলো যথাক্রমে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন-এর ওপরে। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সাল থেকে ধাপে ধাপে (১৯৭৮-৭৯ সালে প্রাথমিক স্তরে, ১৯৮০-৮২ সালে নিম্নমাধ্যমিক স্তরে ও ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে) এই নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু করা হয়।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ পরিচিতি' নামে একটি বিষয় প্রবর্তন করা হয়; তাছাড়া এতে শিশুদের কর্ম-অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয়। নিম্নমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে সমন্বিত করে 'সাধারণ বিজ্ঞান' ও ইতিহাস, পৌরনীতি ও ভূগোলের বিষয়বস্তু সমন্বয় করে 'সমাজ বিজ্ঞান' বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়। এই স্তরেও অন্তত কাগজে-কলমে কর্মমুখী শিক্ষা/কর্ম-অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যদিও কার্যত শিক্ষা দান প্রক্রিয়ায় এ বিষয়টি কখনোই তেমন গুরুত্ব পায় নি। মাধ্যমিক স্তরে ষাট ও সত্তরের দশকের বহুমুখী শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে একটি একমুখী সাধারণ ধারার শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এই ধারার আওতায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যাকে সমন্বিত করে 'সাধারণ বিজ্ঞান' সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে সমন্বিত বিষয় হিসেবে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়।

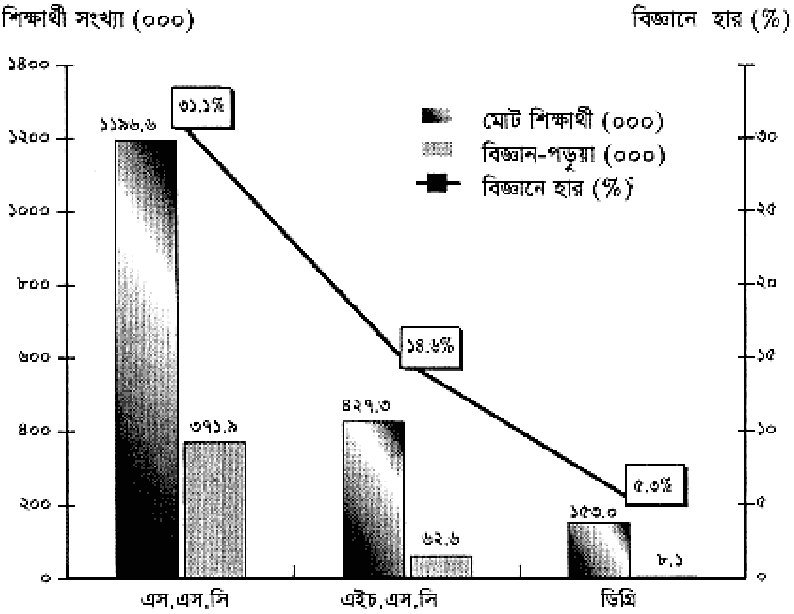
চিত্র ২ : মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর হার কমে যাচ্ছে



পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নানা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়। যেমন ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী

শিক্ষার জায়গায় কার্যত 'কলা' ও 'বিজ্ঞানে'র দু'মুখী শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করা হয়। কলা ধারার শিক্ষার্থীদের জন্য 'সাধারণ বিজ্ঞান' আর আগের মতো আবশ্যিক রইল না, হল ঐচ্ছিক; তার ফলে আশির দশকের শেষভাগে মাধ্যমিক স্তরের মাত্র ৪০ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার সুযোগ পেত; সেটা নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আরো কমে মাত্র ২৭ শতাংশ দাঁড়ায় (চিত্র ২)। এভাবে সারা পৃথিবী যখন ক্রমেই বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর বেশি করে গুরুত্ব দিচ্ছে তখন আমাদের দেশে ভুল পরিকল্পনার ফলে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞাননির্ভর অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ মাধ্যমিক পর্যায়ের মতো সংকুচিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও। ডিগ্রি কলেজগুলোতে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর হার ছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ, সেটা আশি ও

চিত্র ৩ : শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞান-পড়ুয়ার হার অধোগামী (১৯৯৩)



নব্বইয়ের দশকে ক্রমাগত কমতে কমতে ১৯৯৫ সালে নেমে এসেছে ৫ শতাংশের নিচে। অথচ আমাদের আশেপাশের অনেক দেশে এই হার ৫০ শতাংশের ওপরে।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন বলেছিল প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষা অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাঁরা ইংরেজি ও ধর্মীয় শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে শিক্ষাসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নতুন যে শিক্ষাক্রম চালু হল তাতে প্রথম শ্রেণী থেকে ধর্মশিক্ষা এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৯৭৯ সালে একটি অর্ন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে ড: মফিজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়। কিন্তু এগুলোরও বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। আশির দশকে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক স্তরের প্রায় শুরু থেকেই ইংরেজি ও ধর্ম শিক্ষার আবরণে আরবি ভাষা ঢোকানো হয়েছে। কমিশন যে সর্বজনীন আট বছর মেয়াদী একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে কার্যত এক ত্রিমুখী শিক্ষার ধারা চালু হল—তাতে বাংলাভিত্তিক সাধারণ শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে একটি আরবিমুখী ও আরেকটি ইংরেজিমুখী ধারা। দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনি ত্রিমুখী শিক্ষা কতখানি সহায়ক তা আমাদের আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

যে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন স্থাণু থাকতে পারে না, তেমনি শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচিরও ক্রমাগত নবায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে তেমন কোন ব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠে নি। আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে নানা সমস্যা আছে; কিন্তু সে সবের নিরসনের কোন সুব্যবস্থা নেই। ১৯৮১ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' নামে একটি সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু দু'বছর পরই তাকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' গঠন করা হয়। সরকার নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান ও তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য সমন্বয়ে এই বোর্ডের যে গঠনতন্ত্র তাতে বাইরের শিক্ষাবিদ বা বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রতিফলন ঘটার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

সাম্প্রতিককালে প্রধানত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় 'অর্জনযোগ্য প্রান্তিক যোগ্যতা' চিহ্নিত করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষাক্রম পরিমার্জনা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তাড়াহুড়া করে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীতে এই নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম নবায়ন করার সময় সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের চাহিদা, বিষয়বস্তুর আধুনিকায়নের সমস্যা, শিক্ষাদানের ভৌত সুযোগ-সুবিধা এসব নানা বিষয় গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয়। আমাদের দেশে প্রায়ই এধরনের বিচার-বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় না; তার ফলে তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে

যে শিক্ষাক্রম চালু হয় তা কিছুদিন পরই ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখিন হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও এরকম হবার আশংকা এর মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

নতুন মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ধর্মশিক্ষা ও কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্য অর্থনীতি দশম শ্রেণী পর্যন্ত সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে গিয়ে বিজ্ঞান ও গণিতের বিষয়ের পরিমাণ কমাতে হয়েছে। এর ফলে যে সব শিক্ষার্থী পরবর্তীকালে উচ্চতর বিজ্ঞান, প্রকৌশল বা চিকিৎসা শিখতে চায় তাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক আকারে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশে এ বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হলেও তেমন অগ্রগতির লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আর তার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার সংকোচন দেশের ভবিষ্যতের জন্য খুব আশাপ্রদ কোন সম্ভাবনার আভাস দেয় না।

হতাশার চিত্র

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে শিক্ষা ও শিক্ষাক্রমের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হতাশাব্যঞ্জক বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। যখন আমরা আকস্মিক অগ্রগতির কোন বিদ্যুৎছটা দেখি তখনও একটু খতিয়ে দেখলে তাকে অনেকাংশে মেকি বলে মনে হতে পারে। ১৯৯৪ সাল থেকে পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের নামে কম্পিউটারে ফলাফল ঘোষণার জন্য যখন পূর্বঘোষিত ৫০০ পদের প্রশ্নব্যাঙ্ক থেকে প্রশ্ন করা শুরু হয় তখন নাটকীয় ফলাফল পাওয়া যায়; অসংখ্য পরীক্ষার্থী তারকা-নম্বর পেতে থাকে। তেমনি যখন ১৯৯২ সালে সরবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়, তখন একথা ভোলা যায় না যে, ১৯৫১ সালেও একটি আইন পাস করে এদেশে সাড়ম্বরে 'বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প' উদ্বোধন করা হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিন পরই সে প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়। এবারের উদ্যোগ দ্রুত এবং সর্বাংশে বাস্তবায়িত হোক এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা। তবে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়লেও যদি সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের গুণগত মান উন্নত না হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও বিদ্যালয় সমাপ্তির হার বাড়ানো না যায় তাহলে বাধ্যতামূলক 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা' এক কাল্পনিক মাকাল ফল হয়েই থাকবে।

বলাবাহুল্য শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতিকে দেশের ব্যাপক রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনের পরিস্থিতি থেকে পৃথক করে দেখা চলে না, বরং বলা যায় মূলত রাজনৈতিক অঙ্গনের কলুষ থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্গতির সূত্রপাত; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতিই ক্রমে ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে আজকের অরাজক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। আর তাই বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন যে আট বছর মেয়াদী

একমুখী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল তা থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি; শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রায়ণ ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত ক্রমেই এই ব্যবস্থা বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ এবং যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭ শতাংশে উন্নীত করার সুপারিশ করেছিলেন; কিন্তু দু'দশক পরও এই অঙ্ক দু'শতাংশের গণ্ডির বেশি ওপরে তোলা যায় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যয়ের হার পৃথিবীর গরিব উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও একেবারে শেষের সারিতে; অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে এই হার তিন থেকে চার শতাংশের মধ্যে।

আজকের দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের যেসব মৌলিক সমস্যা–অর্থাৎ জীবনমানের উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য সুরক্ষা এবং বিশ্বশান্তি—সে সবেরই সমাধানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার বিকাশ ও ব্যাপক আয়োজন। সারা পৃথিবীতে আজ গণতন্ত্রের হাওয়া বইছে; অস্ত্রসজ্জার নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে মানুষ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে; এ অবস্থায় আমাদের দেশে 'ক্যাডেট কলেজ' নামের ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলোর অস্তিত্ব নিতান্ত বিসদৃশ হয়ে ওঠে। এককালে মুখ্যত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে স্থাপিত হলেও আজ আর এগুলো দেশ রক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এসব বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পেছনে যে ব্যয় তার পরিমাণ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীপিছু ব্যয়ের প্রায় বিশগুণ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয়েরও অন্তত দ্বিগুণ। নাম পালটে এগুলোকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আসলে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হবার কথা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমগ্র জনসমাজের উন্নয়ন—সারা দেশের মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তির স্ফুরণ, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার বিকাশ। এজন্য শিক্ষার ব্যবস্থাপনার যেমন গণতন্ত্রায়ণ প্রয়োজন, তেমনি গণতন্ত্রের প্রবর্তন চাই শিক্ষার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াতেও। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি জোর পড়বে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার ওপরে; সেইসঙ্গে জোর দিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান চেতনায় জনজীবনকে অভিষিক্ত করার ওপরে। এছাড়া শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের নিরবচ্ছিন্ন পরিমার্জনা, নবায়ন ও উন্নয়নের সুসংহত ব্যবস্থা চাই; তেমনি চাই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র যে শিক্ষক সমাজ তাদের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের পরিবেশ।

জাতিসংঘ ঘোষিত দু'হাজার সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' অর্জন আজ বাংলাদেশের জন্য দুঃসাধ্য মনে হয়; তবে এই সময়ের মধ্যে এদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার বাড়িয়ে অন্তত ৬০ শতাংশ, এমনকি ৮০ শতাংশে তুলতে না পারার কোন কারণ

নেই। সেজন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তারের ও বিকাশের ব্যাপক বহুমুখী কর্মসূচি। এদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আজকের গভীর দারিদ্র্য ও দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য এছাড়া আর কোন সহজ পথ নেই।

উপানুষ্ঠানিক ধারার বিকাশ

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার বিকাশ ঘটেছে। জ্ঞানের জগতে আর মানুষের সমাজে আজ যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে, দেখা যাচ্ছে শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সব মানুষের শিক্ষার চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারছে না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে নানা বয়সের ও নানা স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন করা হচ্ছে। মূলত নির্দিষ্ট বয়সে যারা বিভিন্ন কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নি বা যুক্ত হয়েও নানা সমস্যার জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার উদ্ভব। এই ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি কম, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় এবং জীবনঘনিষ্ঠ।

উন্নত দেশগুলোতে সব নাগরিকের প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষার আয়োজন মূলত আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই করা হয়; শুধু মৌলিক শিক্ষার অতিরিক্ত যে জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন তার আয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা অপর্যাপ্ত; তাই প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি নানা ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এদেশে সরকারি উদ্যোগে ১৯৮০ সালে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা অল্পদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৮৭ সাল থেকে প্রকল্প আকারে প্রথমে 'গণশিক্ষা কর্মসূচি' নামে এবং তারপর ১৯৯২ সালে 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম' নামে এধরনের কর্মসূচি চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছুটা সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এবং কিছুটা বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নামে প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম চলছে।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব বলে গৃহীত হলেও দেখা যায় শুধু সরকারের পক্ষে দেশের সব শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠছে না; তার ফলে যেমন দেশে অনেক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে তেমনি অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমে এগিয়ে

আসে। এভাবে আজ দেশে চার শ'র বেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করেছে। এসব সংস্থার উদ্যোগে গত দু'যুগে প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু-কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৪ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে অন্তত ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী (তার মধ্যে প্রায় ৬৩ শতাংশ মেয়ে), বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করছে আরো প্রায় ৯ লক্ষ নারী-পুরুষ (তার মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী), আরো চার লক্ষের ওপরে রয়েছে কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রে। এই হিসেব কিছুটা অসম্পূর্ণ, কাজেই প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এর বেশিও হতে পারে।

তবু এভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে, আজ সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রতি বছর ২১ লাখের মতো শিশু-কিশোর এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে ১৫-৪৫ বছর বয়ঃসীমার প্রায় ১১ লাখ মানুষ অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অবশ্য যারা সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাদের সবাই শেষ পর্যন্ত সাক্ষর হয়ে উঠবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের দেশে ১৫+ বয়সের বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা চার কোটির ওপরে। যদি দশ লাখ বয়স্ক লোককেও প্রতি বছর সাক্ষর করে তোলা হয় তাহলে এ হারে চললে আজকের নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করে তুলতে অন্তত চল্লিশ বছর সময় দরকার। এই হিসেবের মধ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচি থেকে ঝরে পড়ার হার ধরা হয় নি। তাছাড়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি থেকেও প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়ে মাঝপথে ঝরে পড়ে, তাই আগামী দিনগুলোতে ক্রমাগত নতুন নতুন বয়স্ক নিরক্ষর তৈরি হতেই থাকবে।

জীবনের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা

শিক্ষা ব্যাপারটা তো শুধু নিছক জ্ঞান বিতরণের জন্যই নয়, শিক্ষার প্রয়োজন আসলে জীবনের জন্য, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য। এদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত গড়ে উঠেছিল বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে, তাই তাতে এদেশের জনগণের জীবনের বাস্তব চাহিদার চাইতে শাসকের চাহিদা অর্থাৎ প্রশ্নহীন আজ্ঞাপালনকারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছিল। সে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল কর্মজীবন নয়, চাকুরিজীবন। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘকালের স্বাধীনতার পরও সেই ঔপনিবেশিক কাঠামোর ছাপ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই কী শিক্ষাদান পদ্ধতিতে, কী পরীক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যের গলাধঃকরণ বড় হয়ে ওঠে—সে তথ্যের বিশ্লেষণ বা প্রয়োগ নয় কিংবা নতুন তত্ত্ব বা তথ্যের অনুসন্ধানও নয়। জীবন থেকে

শিক্ষা এমন বিচ্ছিন্ন বলেই শিক্ষিত ব্যক্তি প্রায়শ উৎপাদনশীল হয় না, কেবল নিরাপদ চাকুরির সন্ধানী হয়। আর শিক্ষাসূচি বা শিক্ষাদান পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত নয় বলেই সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা গ্রহণে তেমন অগ্রহী হয়ে ওঠে না।

সবার জন্য শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে আসলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য কি এবং কি পদ্ধতিতে সে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে তা আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্রম কি দেশের সব মানুষের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তৈরি হয়েছে? পাঠ্যবই, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা ব্যবস্থা–এসবও কি সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে? করছে না যে সেকথা আমাদের সবার অভিজ্ঞতা থেকেই মোটামুটি স্পষ্ট। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক স্তরে সব শিক্ষার্থীর জন্য কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছিল; সেই কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে কর্মমুখী শিক্ষার ধারাও আজ কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণীর পর দেশে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারা রয়েছে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় যেখানে নবম-দশম শ্রেণীতে দশ লাখের ওপর শিক্ষার্থী, সেখানে ৫১টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলিয়ে মোট শিক্ষার্থীসংখ্যা দশ হাজারও নয় অর্থাৎ আজ মাধ্যমিক স্তরে এক শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু যে জীবনবিমুখ তা নয়, গণতন্ত্রের সঙ্গেও তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। গণতন্ত্রের অভাব যেমন শিক্ষাক্রম প্রণয়নে, তেমনি পাঠ্যপুস্তক রচনায়, শিক্ষাদান পদ্ধতিতে, শিক্ষা প্রশাসনে ও ব্যবস্থাপনায়। গণতন্ত্র চর্চার সমস্যার স্পষ্ট প্রকাশ শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিপুল বৈষম্যে। এই বৈষম্য প্রকট শহর ও গ্রামের মধ্যে, সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে, পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে—আরো নানাভাবে। শহরে বয়স্ক সাক্ষরতার যে হার (৬২ শতাংশ), গ্রামাঞ্চলে তার অর্ধেকেরও কম (২৯ শতাংশ); আবার পুরুষদের মধ্যে যে সাক্ষরতার হার (৪৪ শতাংশ), মেয়েদের মধ্যে তার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ (২৬ শতাংশ)। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বার্ষিক যে ব্যয় হয়, সরকারি বিদ্যালয়ে হয় তার প্রায় তিনগুণ বেশি, আবার ক্যাডেট কলেজজাতীয় অভিজাত বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে বার্ষিক ব্যয় সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়েও প্রায় ২০ গুণ বেশি।

বলা বাহুল্য একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা শুধু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নয়, মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে, গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে, জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমুখী চেতনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি রচনাতেও অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সামাজিক-

সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চারের লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। সব মিলিয়ে শিক্ষাকে গণ্য করতে হবে একটি হাতিয়ার হিসেবে—নতুন জীবন ও উন্নত সমাজ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে। আর এ হাতিয়ারকে তুলে দিতে হবে দেশের প্রত্যেক মানুষের হাতে। সারা দেশের মানুষ শিক্ষার হাতিয়ার ব্যবহার করে সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করলেই কেবল দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে।

আজ দেশের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীরা ক্রমেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন। এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবীও তাই নানা মহল থেকে উঠছে। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নানা ধরনের পরীক্ষামূলক শিক্ষা কার্যক্রম। ইতোমধ্যে এদেশের দরিদ্র মেহনতি মানুষদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতায়, শিক্ষা ও আনন্দের মিশ্রণে, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশে এবং তাদের ঝরে পড়া প্রতিরোধে এসব শিক্ষাপদ্ধতি তাদের উপযোগিতার পরিচয় দিয়েছে। ব্র্যাক, গণসাহায্য সংস্থা, প্রশিকা—এসব সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার তুলনায় উপযোগমূল্যের বিচারে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয় বলেও স্বীকৃত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্প্রতি বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হলেও এখনও এই ঘোষণা নামমাত্র কার্যকর হয়েছে। সত্যিকার অর্থে প্রাথমিক শিক্ষাকে সংবিধানসম্মতভাবে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হলে এবং সমগ্র দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হলে অবিলম্বে কতকগুলো জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- **ভৌত ব্যবস্থাদির সম্প্রসারণ**: জরিপের মাধ্যমে দু'কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে সব শিশুর জন্য পাঁচ বা ছ'কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে; বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ উন্নত করে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থীর বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, শৌচাগার, যথেষ্ট পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক, খাতা-পেন্সিল, বোর্ড, চক প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করতে হবে; এছাড়া সারা দেশে দরিদ্র শিশুদের, বিশেষত মেয়ে শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তাদের স্কুলের পোশাক ও দুপুরে টিফিন সরবরাহ করতে হবে।
- **শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির মান উন্নয়ন**: শিক্ষার শুধু পরিমাণগত বিস্তারই যথেষ্ট নয়; শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আকর্ষণীয় শিক্ষাসূচি প্রবর্তন এবং তাতে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে, চারপাশের পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতে আনন্দের উপকরণ সংযোজন করতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ধাঁচ নিরানন্দ ও একঘেয়ে, পরিদর্শনও দায়সারা গোছের; ফলে শিক্ষার্থীদের বিরাট অংশ প্রাথমিক স্তর অতিক্রম না করেই ঝরে পড়ে এবং আবার নিরক্ষরে পরিণত হয়; শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ঝরে পড়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

- **যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণ:** শিক্ষার্থীসংখ্যা এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংগতি রেখে উপযুক্ত মানের শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; নিয়োগের সময় যথাসম্ভব স্থানীয় শিক্ষকদের ও মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন:** ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীসহ বিদ্যালয়ে যেতে অপারগ এমন শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সম্প্রতি একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; তার প্রধান কাজ হতে পারে জনগণের জন্য সাক্ষরতা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় ইত্যাদি প্রয়োগমুখী বিষয়ের শিক্ষাকে একই খাতে প্রবাহিত করে সকল উপানুষ্ঠানিক ও সম্প্রসারণমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। দেশে আজ যে সব বেসরকারি সমাজসেবী সংস্থা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও গণসাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণে এগিয়ে এসেছে তাদের শিক্ষামূলক কার্যক্রমে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

- **বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির প্রসার:** সমগ্র দেশে ব্যাপক সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন করা প্রয়োজন; বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের জন্য বিশেষ করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। সমিতি গঠন, আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এধরনের কর্মসূচি আয়োজিত হলে তা বয়স্কদের অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে তরুণ সমাজ ও সকল শিক্ষিত মানুষকে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

- **অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষার আয়োজন:** অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যারা সাক্ষর হচ্ছে তাদের দক্ষতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনুসারক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বই, পত্র-পত্রিকা, গ্রাম্য পাঠাগার, ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার প্রভৃতির মাধ্যমে অনুসারক কার্যক্রম শক্তিশালী করা যেতে পারে; অনুসারক শিক্ষার পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। এজন্য প্রচুর শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক বইপত্র ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনও প্রয়োজন।

- **শিক্ষার জন্য সামাজিক আন্দোলন :** সাক্ষরতা ও সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের প্রশ্নটি আজ এমন এক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, একে একটি বড় রকম জাতীয় আন্দোলন হিসেবে দেখতে হবে। এই আন্দোলনে সরকারি-বেসরকারি সকল শক্তিকে অংশীদার করতে হবে; সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকারক অনুষ্ঠান সকল গণমাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় বরাদ্দের অর্ধেকেরও কম; এই বরাদ্দ অবিলম্বে অন্তত দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে প্রকৃতই শিক্ষামূলক কাজে দক্ষতার সঙ্গে ব্যয় হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাবিদগণ প্রাথমিক স্তরে মূলত মাতৃভাষা শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। এদেশে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনসহ সকল শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা শিক্ষা দানের বিপক্ষে মত দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলা ছাড়াও বিদেশি ভাষা ইংরেজি এবং ধর্মীয় ভাষা আরবি, সংস্কৃত প্রভৃতির বোঝা কোমলমতি শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভাষার বোঝা কমানো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে একটি জরুরি প্রয়োজন।

বাংলাদেশের সংবিধানে 'একই পদ্ধতি'র, 'গণমুখী' ও 'সর্বজনীন' শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরা আজ তা থেকে বহুদূরে সরে এসে এক বিচিত্র ত্রিমুখী শিক্ষার ধারা সৃষ্টি করেছি। একে মোটেই এদেশের জনগণের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের অনুকূল বলে বিবেচনা করা যায় না। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসূচিতে অবিলম্বে সমতা আনার উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার প্রশ্ন আজ বাংলাদেশের জীবন-মরণের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং বিকাশও এই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর নির্ভরশীল। এই ভিত্তিতেই আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের লড়াইতে দেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশ গ্রহণ জরুরি।

সবার জন্য শিক্ষা

অমর একুশ ও গণশিক্ষা

আমাদের জাতীয় জীবনে অমর একুশের যে কী বিশাল গুরুত্ব তা আমরা সবাই জানি। এও জানি যে, একুশের আন্দোলন মূলত ভাষার দাবি থেকে শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে তা জাতীয় সত্তার বিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার ও তা থেকে এক মহান স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। আর তারই পরিণতিতে জন্ম হয়েছে আজকের বাংলাদেশের।

দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগকে নানাভাবে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল; পরাধীনতার শেকল ভেঙে এক নতুন জীবন লাভের স্বপ্ন সেদিন উদ্বেলিত করেছিল এদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষকে। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনও ত্যাগ স্বীকারই সেদিন অসম্ভব মনে হয় নি। এই ত্যাগের মন্ত্র মূলত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। আজ যে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথে পা বাড়াতে পেরেছি তার পেছনে একুশের শহীদদের রক্ততর্পণ তাই এক অসামান্য ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে।

অমর একুশের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির স্বীকৃতিতে বা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলেই এ আন্দোলনের অবসান ঘটে নি, বরং আমাদের আত্মবিকাশের চেতনা প্রতি বছর অমর একুশে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে নতুন করে উজ্জীবিত হয়, সকল বাঙালির মনে তা নতুন জীবন সৃষ্টির পথে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর আমরা চার দশক পেরিয়ে এসেছি। কালের গণ্ডি পেরিয়ে দিনে দিনে এ সত্যটি আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একুশের মর্মবাণীতে একদিকে

[বাংলা একাডেমীতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে প্রদত্ত অমর একুশে বক্তৃতা: কিছুটা পরিবর্তিত]

যেমন রয়েছে বাংলাভাষা, তেমনি রয়েছে এদেশের মানুষ আর তাদের আত্মবিকাশের প্রশ্ন। ১৯৯৪-এর অমর একুশে বক্তৃতায় অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেছিলেন, "অমর একুশের ভাষা জাতির সৃষ্টিশীল আত্মবিকাশের ভাষা।" প্রতি বছর তাই আমরা যখন অমর একুশে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান করি তখন সেই সৃষ্টিশীল আত্মবিকাশের পথে জাতি কতদূর এগোতে পেরেছে তারই সালতামামি করতে বসতে হয়। আমাদের আত্মবিকাশের পথে আজো তেমন প্রবল বেগ সঞ্চারিত হয়েছে একথা হয়তো কেউ বলবেন না। কিন্তু অন্তত আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা সে প্রসঙ্গটি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে পথটা যেমন সঠিক হওয়া প্রয়োজন তেমনি চলার বেগটাও হওয়া চাই যথার্থ; তা নইলে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ ক্রমশই আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকবে আর আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের ডামাডোলে আমরা বিশ্বের দরবারে কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকব।

শিক্ষা এত জরুরি কেন

প্রশ্ন হতে পারে : শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর এতটা গুরুত্ব আমরা কেন দিচ্ছি? এই বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দুনিয়া জোড়া যে উন্নয়নের রাজনীতি তার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কই বা কি?—আজকের দিনে উন্নয়নকে আর নিছক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হিসেবে দেখা হয় না। উন্নয়ন বলতে বোঝানো হয় মানুষের অগ্রগতিকে। আর এই মানুষের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় উপকরণ হল তার শিক্ষা। তাই যথোপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন আজ সম্ভব বলে বিবেচনা করা যায় না। তাছাড়া আমাদের চারপাশের পৃথিবী আর সমাজ অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব হারে বিকাশ ঘটছে। তার ফলে ইতিহাসে এই প্রথম আমরা এমন এক ধরনের মানুষ তৈরির আয়োজন করছি যাদের জীবনের প্রধান অংশ কাটবে আগামী দিনের নতুন ধরনের সমাজে যা এখনও তৈরি হয় নি; আর সে সমাজের প্রধান উপাদান হবে এমন এক প্রকৃতির যার সব কিছু এই মানুষদের এখনই পুরোপুরি শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শুধু শিক্ষা নয়, জীবনব্যাপী শিক্ষা ক্রমেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

উন্নত আর উন্নয়নশীল সব দেশের পণ্ডিতজন এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, যদিও সারা পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা আজ বহুদূর এগিয়েছে, এযাবৎকালের এই অগ্রগতির ধারা মোটেই সুষম নয়; আর দুনিয়া জোড়া মানুষের অগ্রযাত্রার পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অশিক্ষা, মানব সম্পদের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। তাই জাতিসংঘ ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের জন্য যে মানব-উন্নয়ন- সূচক ব্যবহার করছে তারও একটি প্রধান উপাদান হল বয়স্ক সাক্ষরতার হার।

সাম্প্রতিককালে দুনিয়ার অনেক প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ গবেষণা করেছেন শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে। এডওয়ার্ড ডেনিসন (Edward F Denison), থিওডোর শুল্‌জ্‌ (Theodore T Schulz), আর্থার লিউইস (Arthur Lewis), রবার্ট সলো (Robert T Solow) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের গবেষণায় ধরা পড়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে উনিশ-বিশ শতকে উৎপাদন শক্তির যে বিপুল বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ঘটেছে তাতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ। এসব দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে অবদান রাখে তা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের চাইতেও বেশি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থিওডোর শুল্‌জ্‌ হিসেব করে দেখিয়েছেন, শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিনিয়োগের ওপর বার্ষিক মুনাফা পাওয়া যায় প্রাথমিক স্তরে ৩৫ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ১০ শতাংশ, আর কলেজ স্তরে ১১ শতাংশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে এধরনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে মোটামুটি একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছে। এসব গবেষণা অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণ হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নের ভূমিকাকেই বড় করে তুলে ধরেছে।

সাম্প্রতিককালে প্রাচ্যের ক'টি দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। তাদের কখনো কখনো বলা হয় 'দ্য এশিয়ান টাইগার্স' বা এশিয়ার ব্যাঘ্রকুল। এদের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যায় জাপান, তারপর তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। ১৯৬৫-৯০ সময়কালে যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাথা পিছু বার্ষিক জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১.৯ শতাংশ সেখানে এই ক'টি দেশের গড় প্রবৃদ্ধির হার হয় ৫.৬ শতাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। গত পঁচিশ বছরে এই দেশগুলোর প্রবৃদ্ধির হার পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির চেয়েও বেশি।

এসব দেশের এমন নাটকীয় অগ্রগতি সারা দুনিয়ার অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিপুল আগ্রহ আর কৌতূহলের সঞ্চার করেছে। তাঁরা নানা ধরনের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখেছেন এদের এই অগ্রগতির মূলে প্রধান যে জিনিসটি কাজ করেছে সে হল মানব সম্পদের উন্নয়ন। দীর্ঘকাল ধরে এই দেশগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নে, বিশেষ করে সর্বজনীন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে যে পরিমাণ উদ্যোগ নিয়েছে দুনিয়ার খুব কম উন্নয়নশীল দেশেই তা ঘটেছে। তাছাড়া এসব দেশের সরকার প্রয়োগমুখী গবেষণার জন্যও প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

জাপানে দেশের ও শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয় ১৮৬৮ সালে মেইজি সংস্কারের সময় থেকে; ১৮৭২ সাল থেকে সারা দেশে চার বছরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। উল্লেখ্য যে, তার মাত্র দু'বছর আগে ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন হয়। জাপানের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এশিয়ার নব্য উন্নত সব দেশে প্রথমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং তার পর পরই সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া এসব দেশের শিক্ষাসূচিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে যে ক'টি দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে সফল তাদের প্রায় সবারই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর হার বয়ঃক্রমের শতকরা ১০০ ভাগ বা তার বেশি (১০০ ভাগের বেশি হবার অর্থ ঐ স্তরে যে-বয়সীদের পড়বার কথা তাদের বেশি বা কম বয়সীও কিছু ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে রয়েছে)। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরেও সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বয়ঃক্রমের ৬০ শতাংশ বা তার বেশি। এসব উন্নত এশীয় দেশগুলোর সাফল্যের আর একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতে শিক্ষার জন্য তাদের ব্যয় যেমন বেশি তেমনি এই ব্যয়ের সিংহভাগ তারা নিয়োগ করে বুনিয়াদি শিক্ষার ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে সর্বব্যাপী দারিদ্রের কথা সবারই জানা। এদেশে মাথা পিছু জাতীয় আয় গড়ে মাত্র ২২০ ডলার, আর এযাবৎ বড় আকারের কোন খনিজ সম্পদ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। আজ থেকে মোটামুটি দু'শ'-আড়াই শ' বছর আগে, অর্থাৎ ইংরেজদের আবির্ভাবের সময়ে, এদেশ দুনিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিবেচিত হত; কিন্তু আজ অবস্থা একেবারে ভিন্ন।

এমন সম্পদের অভাবের দেশে স্বভাবতই জনগণের চরম দারিদ্রের লাঘব করাই হল এদেশের অগ্রগতির প্রধান সমস্যা আর এক্ষেত্রে সাধারণভাবে শিক্ষার বিস্তার এবং জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের একটা প্রধান ভূমিকা থাকবার কথা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এরকম পরিস্থিতিতে একটি জরুরি প্রয়োজন হল সমগ্র জনগণের মধ্যে বুনিয়াদি শিক্ষার বিস্তার। বাংলাদেশে মোট বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ লিখতে পড়তে পারে না। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে সরকারি হিসেবে ৯২ শতাংশ স্কুলে যাবার সুযোগ পায়, তবে তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ওপরে প্রাথমিক স্কুল শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এদেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে দেশের অন্তত ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য আট-বছর মেয়াদী বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা অবিলম্বে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে দেশের বিপুল সংখ্যক বয়স্ক মানুষের জন্যও চাই উপানুষ্ঠানিক বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা। এই বুনিয়াদি

শিক্ষায় ভাষা সাক্ষরতা ও গণিত সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশগত সাক্ষরতাও সব মানুষের কাছে লভ্য করে তুলতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সারা পৃথিবীর মাপকাঠিতে বাংলাদেশ দেশ হিসেবে তেমন বড় নয়, তবে যথেষ্ট বড় লোকসংখ্যার বিচারে। লোকসংখ্যার মাপে বাংলাদেশের চেয়ে বড় দেশ পৃথিবীতে আছে মাত্র আটটি; চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, রাশিয়া, জাপান আর পাকিস্তান। অথচ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচাইতে গরিব দেশগুলোর মধ্যে একটি। মাটি, পানি আর অপরূপ সুন্দর প্রকৃতি ছাড়া অন্য বস্তুসম্পদ বাংলাদেশের তেমন বেশি নেই; মানুষেরাই হল এদেশের সবচাইতে বড় সম্পদ। তাই বাংলাদেশকে আগামী দিনে এগোতে হলে তার মানবসম্পদ উন্নয়নের কথাই ভাবতে হবে সবার আগে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রশ্নটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথম দিকের দিনগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। সেজন্য ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম একটি পদক্ষেপ ছিল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। ডঃ মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে এই কমিশন দু'বছরের মাথায় বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে একটি প্রতিবেদনও দাখিল করে। তার পর পরই দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে, ফলে রিপোর্টটি সরকারিভাবে তেমন গুরুত্ব পায় নি। তবে পাকিস্তানী শাসনামলের পুরনো শিক্ষাক্রমকে বদলে ফেলা নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল বলে সত্তরের দশকের শেষে প্রাথমিক স্তরের এবং আশির দশকের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কিছুটা পরিবর্তন ঘটানো হয়। আশির দশকের গোড়ায় সরকারিভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তাও সেভাবে মোটেই এগোয় নি। ১৯৮২-তে আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটায় সরকারি সাক্ষরতা কর্মসূচিটি বাতিল হয়ে যায়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে এদেশে মানবসম্পদ বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এভাবে তা একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষা খাতে সম্পদ বরাদ্দও অন্যান্য খাতের তুলনায় ক্রমাগত কমতে কমতে আশির দশকে নিম্নতম পর্যায়ে (মোট জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা মাত্র একভাগের কাছাকাছি) নেমে আসে।

এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে। উন্নত-উন্নয়নশীল সব দেশের পণ্ডিতজন আর সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, যদিও সারা পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা আজ বহুদূর এগিয়েছে, এযাবৎকালের এই অগ্রগতির ধারা মোটেই সুষম নয়; আর দুনিয়া জোড়া মানুষের অগ্রযাত্রার পথে আজ প্রধান বাধা হল অশিক্ষা—মানব সম্পদের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি ঐতিহাসিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়; তাতে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে শিক্ষালাভ এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়। ১৯৯০-এর শুরুতে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সব দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন। তাতে দু'হাজার সালের মধ্যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য মৌলিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পক্ষ থেকে সে বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯০। তাতে দুনিয়ার দেশে দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি ঘটেছে, কোন্ কোন্ দেশ এদিক থেকে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে তার একটা সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়। বলা হয় একটি দেশের মানুষের শুধু মাথা পিছু আয় সে দেশের মানব সম্পদের মানের যথার্থ সূচক নয়। কোন দেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি হলেও মানুষের গড় আয়ুষ্কাল যদি কম হয়, শিশু মৃত্যুর হার বেশি হয় বা শিক্ষার হার কম হয় তাহলে সেদেশে মানুষের জীবনের মান উঁচু বলা যায় না। তাই এই প্রতিবেদনে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু, বয়স্ক শিক্ষার হার, গড় মাথা পিছু আয় ইত্যাদি কয়েকটি পরিমাপের ভিত্তিতে একটি 'মানব উন্নয়ন সূচক' নির্ধারণ করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছরই ধারাবাহিকভাবে এধরনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে আসছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুনিয়ার সব দেশের প্রায় একেবারে পেছনের সারিতে বসে বাংলাদেশ এসব আন্তর্জাতিক উদ্যোগে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়। অবশ্য তার পক্ষে এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। কেননা এর পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশা। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত অধোগতির দিকে চলেছিল; তারই পরিণতিতে ১৯৯০-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ দেশের জনগণের বাস্তব পরিস্থিতি এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৯৯০ সালের মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থানের ক্রম ছিল ১৩০টি দেশের মধ্যে ১০৮; ১৯৯৫ সালের তালিকায় দাঁড়ায় ১৭৪টি দেশের মধ্যে ১৪৬। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানব উন্নয়ন সূচককে একক ধরে বাংলাদেশের সূচক ১৯৯০ সালে ছিল ০.৩১৮, ১৯৯৫ সালে হয় ০.৩৬৪। একে তেমন কোন অগ্রগতি বলা যায় না। প্রসঙ্গত এই অঞ্চলের আরেকটি দেশ শ্রীলঙ্কার কথা উল্লেখ করা যায়; উচ্চ প্রত্যাশিত আয়ু (৭১.৯ বছর, বাংলাদেশে ৫৫.৬ বছর) এবং উচ্চ বয়স্ক সাক্ষরতার হারের (৮৯.৩%, বাংলাদেশে ৩৬.৪%) ফলে এদেশের অবস্থানের ক্রম ৯৭ আর মানব উন্নয়ন সূচক ০.৭০৪—ফিলিপাইন ও চীনের ওপরে।

সাক্ষরতা ও সবার জন্য শিক্ষা

আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বহুকাল থেকে নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা চলে আসছে। অনেকের ধারণা মানুষকে নাম সই করতে শেখালেই সাক্ষরতা দেওয়া হল; আর তাতেই সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। কিন্তু আসলে সাক্ষরতা হল শিক্ষা লাভের একেবারে প্রাথমিক একটি ধাপ। সাধারণভাবে সাক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করাকে বোঝায়; সাক্ষর মানুষ অর্থ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। কাজেই সরলভাবে দেখলে সাক্ষরতা মানে অক্ষর চিনে পড়তে পারা, লিখতে পারা ও হিসেব-নিকেশ করতে পারা; সুতরাং যিনি পড়তে, লিখতে ও হিসেব-নিকেশ করতে পারেন তিনিই সাক্ষর। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে সাক্ষর ও সাক্ষরতার সংজ্ঞারও আবার নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এসব সংজ্ঞা ছিল এ ধরনের:

১৯৫১ : স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোনো বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা।

১৯৬১ : যে বুঝে কোনো ভাষা পড়তে পারে সে-ই সাক্ষর।

১৯৭৪ : যে কোনো ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর বলে গণ্য করা যায়।

১৯৮১ : যে কোনো ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা যায়।

১৯৮৯ : মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসেব করা এবং লিখে রাখার ক্ষমতা।

শেষের সংজ্ঞাটি থেকে বোঝা যায় সাক্ষরতা মানে: মুখের ভাষা ও ছাপার ভাষার মাঝখানের সংযোগ বুঝতে পারা; শব্দ চেনা এবং অর্থ বোঝা; লেখা এবং ভাব প্রকাশ; নির্দেশনা বুঝতে পারা; মূলভাব ও ধারণা বুঝতে শেখা এবং হিসেব-নিকেশ করতে শেখা।

সাক্ষরতার সঙ্গে আরেকটা শব্দও যুক্ত হয়ে থাকে, সেটা হল ব্যবহারিক সাক্ষরতা। সাধারণভাবে যে সাক্ষরতা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে তা-ই ব্যবহারিক সাক্ষরতা। আরও খতিয়ে দেখলে ব্যবহারিক সাক্ষরতার ফলে মানুষের ভেতরে লেখাপড়া শেখার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সচেতনতা জন্মায়। ব্যবহারিক সাক্ষরতা মূলত বয়স্কদের জন্য। যাঁরা লেখাপড়া করার উপযুক্ত সময় পার হয়ে এসেছেন, প্রধানত তাঁদেরই জন্য ব্যবহারিক সাক্ষরতা কর্মসূচি নেওয়া হয়ে থাকে। এটি লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত, সুবিধা-বঞ্চিত, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা। ব্যবহারিক

সাক্ষরতার এধরনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে: ১. এটি উপানুষ্ঠানিক ধারার; ২. এই সাক্ষরতা বয়স্কদের পেশা/জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; ৩. স্বল্প সময়ের জন্য পরিচালিত; ৪. স্বল্পব্যয়ী; ৫. বিশেষভাবে পরিকল্পিত; ৬. সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সূচনাকারী।

১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল তাতে অবশ্য সব মানুষের জন্য শুধু সাক্ষরতা অর্জনের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে সবার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা। দু'হাজার সালের মধ্যে দুনিয়াজোড়া সবার জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তনের যে অঙ্গীকার এই সম্মেলনে করা হয়েছিল—বাংলাদেশ তাতে সাগ্রহে স্বাক্ষর দেয়। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্কে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ সেখানকার ঘোষণাপত্রেও স্বাক্ষর করে। প্রধানত এই আন্তর্জাতিক বাতাবরণেই বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় এবং তার তিন বছর পর ১৯৯৩ সাল থেকে সে আইন সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ 'শিক্ষা প্রকল্প'-এর আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রম ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন, স্যাটেলাইট স্কুলের প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরিব শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাসে মাসে গম বিলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

এদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি চালু হয় ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচি প্রকল্পটি প্রায় ঐ সময়েই চালু হয়; ১৯৯৫ সালে সেটাকে একটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। শিশু ভর্তির জন্য ব্যাপক প্রচার এবং অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়েছে। এই বাড়ার কিছুটা অবশ্য জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে এমনিতেই ঘটবার কথা। সরকারি হিসেবে বলা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ১৯৯০ আর ১৯৯৪ সালের মধ্যে ১.১৯ কোটি থেকে বেড়ে প্রায় ১.৬৮ কোটি হয়েছে(ইবতেদায়ী ইত্যাদি নিয়ে); এই প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় চারগুণ। সেই সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের হারও শতকরা ৪৫ থেকে কিছুটা বেড়ে ৪৭-এ দাঁড়িয়েছে। বলা হচ্ছে সারা দেশে ৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় ভর্তির হার ৯২ শতাংশে পৌঁছেছে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জন্য ৮২% শিশু ভর্তি হারের যে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছিল প্রকৃত ভর্তিহার এর মধ্যেই তা ছাড়িয়ে গেছে।

প্রাথমিক স্কুলে অপেক্ষাকৃত গরিব ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য, হাজিরা বাড়াবার জন্য এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া প্রতিরোধের জন্য ১৯৯৩ সালে 'শিক্ষার জন্য

খাদ্য' নামে যে কর্মসূচি চালু হয়েছে তাকে সরকারিভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে এযাবৎ দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশে গম দেওয়া হচ্ছে, তাও প্রতিটি নির্বাচিত বিদ্যালয়ের মাত্র ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে অর্থাৎ সারা দেশের এক-দশমাংশ শিক্ষার্থীর কম এভাবে খাদ্য সাহায্য পাচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক বিতরণ ব্যবস্থার ফলে যেমন একদিকে ঐসব বিদ্যালয়ে ভর্তি কিছুটা বাড়ছে তেমনি আবার কাছাকাছি অন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা কমছে; তাছাড়া গম বিলির দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের জন্য সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিলতা এবং তাতে শিক্ষা দানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণে অনেক শিক্ষক বলছেন, এধরনের খাদ্য সাহায্য বরং সব ছেলেমেয়ের জন্য টিফিনের আকারে করা গেলে বা তাদের জন্য স্কুলের পোশাকের ব্যবস্থা করা গেলে তাতে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে স্থায়ী ফল পাওয়া যেতে পারত।

বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে বলা হয়েছে ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৫ শতাংশে এবং শিক্ষার্থীদের পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে ধরে রাখার হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। শিক্ষার্থীসংখ্যা এর মধ্যে বেশ কিছুটা বাড়লেও ধরে রাখার হারে এখনও তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। কিছু কিছু নমুনা জরিপ থেকে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের খাতায় যত ছেলেমেয়ের নাম থাকে বাস্তবে তার মোটামুটি অর্ধেক উপস্থিত থাকছে। অবশ্য যে সব ইউনিয়নে বা যে সব বিদ্যালয়ে গম বিতরণ করা হচ্ছে সেখানে এই হার স্বভাবতই কিছুটা বেশি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেও ২০০০ সালের মধ্যে ৭০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কিনা তা এখনও বলা শক্ত।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা বিস্তারের যে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, তার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের কর্মসূচি তৈরি করা যায় নি। আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অন্তত ৮০ শতাংশকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। সেটা করতে গেলে মৌলিক শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার সীমানা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাড়িয়ে নিতে হয়। অথচ বাংলাদেশে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হচ্ছে না, শুধু ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে আনবার কথা বলা হচ্ছে। আবার যত ছেলেমেয়েকে ভর্তি করা হচ্ছে তার বিশাল অংশকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না, প্রায় অর্ধেক মাঝপথেই ঝরে পড়ছে। এবং যারা শেষ পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করছে তারাও যে সবাই প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করছে তার কোন নিশ্চয়তা নেই; প্রাথমিক জরিপ থেকে মনে হয় তাদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে।

শিশুদের বিদ্যালয়ে আসতে অনীহা এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার কারণ নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপ্ড্), গণসাক্ষরতা অভিযান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কিছু নমুনা জরিপ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় এসব কারণের মধ্যে রয়েছে চরম দারিদ্র্য, বিদ্যালয়ের অনাকর্ষণীয় পরিবেশ, শিক্ষকদের নীরস পাঠদান পদ্ধতি, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দূরত্ব। ১৯৭৩-৭৪ সালে প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি আওতায় নেবার পর থেকে বলতে গেলে দেশে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোটেই বাড়ে নি। তেমনি গত দু'যুগে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়ে দু'গুণের ওপর হলেও সে অনুপাতে মোটেই বাড়ে নি এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা। তার ফলে গত দু'যুগে শিক্ষক-পিছু শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০ থেকে বেড়ে প্রায় ৬৫-তে, কোথাও কোথাও তারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষার্থী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে শ্রেণীকক্ষ বা শিক্ষকসংখ্যা না বাড়িয়ে বিদ্যালয়ে দু'শিফ্ট চালু করে—অর্থাৎ প্রথম দু'ঘণ্টা পড়ানো হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, তার পরের সাড়ে তিন ঘণ্টা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী। এই অতি সরল সমাধানের ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং পাঠের সময় কমেছে। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে যে সময় কাটাচ্ছে তা আশেপাশের অন্যান্য দেশের তুলনায় মাত্র অর্ধেক, চীন প্রভৃতি কোন কোন দেশের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসরে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা অতি অল্প সময়ে প্রচুর শিক্ষার্থীকে পড়াতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন এবং প্রায়শ শিক্ষার নামে সেখানে যা চলছে তা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতামাত্র। স্বভাবতই শিশুরা এধরনের পরিবেশে লেখাপড়ায় কোন আকর্ষণ বোধ করছে না। বাধ্যতামূলক শিক্ষার চাবুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেও শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখা তাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। যে সব শিক্ষার্থী এই পরিবেশেও জ্ঞান লাভের অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে বিদ্যালয়ে টিকে থাকে তাদেরও শিক্ষার মান হয় হতদরিদ্র।

ইতোমধ্যে অবশ্য দেশে বেশ কিছু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাত্র ৬০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় দেশের প্রায় ৮৬,০০০ গ্রামের প্রয়োজন আদৌ মেটাতে পারছে না। কতকগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে কিছু উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। সেগুলোতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সাধারণত ৩০-এর কাছাকাছি; শিক্ষাদানের পদ্ধতি অনেকটা আকর্ষণীয়। কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করার যে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেশের সরকারের ওপর বর্তায় তা পুরোপুরি কাঁধে তুলে নিতে পারে না। তাই এগুলোকে কেবল একটি জরুরি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গণ্য

করা যায়। অবশ্য কোন কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা নানা রকম উদ্ভাবনী শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছেন এবং তা থেকে ভাল ফলও পাওয়া যাচ্ছে। উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া প্রধানত গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা ও শহরাঞ্চলে কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নমুখী ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে দেশের জনগণের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। আমাদের সংবিধানসম্মত একমুখী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি শিক্ষাক্রমে প্রথম শ্রেণী থেকে বিদেশি ভাষা ইংরেজি চাপিয়ে এবং অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে ধর্মীয় ভাষা আরবি প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের ওপর অহেতুক ভাষার বোঝা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাবার স্পৃহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হচ্ছে তেমনি তাদের সৃষ্টিশীল মানসিক বিকাশকে গোড়া থেকেই পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় আজ তাই আনন্দদায়ক জীবনচর্চার কেন্দ্র নয়, বরং এক ভীতিকর বিদ্যা গলাধঃকরণের জায়গা।

শিক্ষা জীবনে ও জাতীয় জীবনে বিদেশি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিকতার নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত স্থান রয়েছে। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বাহন হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধেও কোন দ্বিমত নেই। তবে শিক্ষাবিদগণ প্রাথমিক পর্যায়ের গোড়া থেকে এরকম বাধ্যতামূলক একাধিক ভাষার বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন, বরং মাতৃভাষার দৃঢ় ভিত্তিই সকল শিক্ষার্থীকে পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ও ক্রমবর্ধমান ভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং সৃষ্টিশীল সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। এদেশের কর্ণধারগণ এসব যুক্তিতে কর্ণপাত করছেন না এবং জনগণের আত্মবিকাশের এই প্রতিবন্ধক প্রতিটি শিশুর শিক্ষা জীবনের গোড়াতেই একটি জগদ্দল পাথরের মতো আজো দাঁড়িয়ে আছে। একুশের শহীদরা মাতৃভাষার চর্চাকে যে মানব উন্নয়ন ও জাতীয় মুক্তির সোপান হিসেবে দেখেছিলেন সে স্বপ্ন তাই আজও কেবল স্বপ্ন হয়েই রয়েছে।

গণশিক্ষা বিস্তারে নানা সীমাবদ্ধতা

নব্বইয়ের দশকে সবার জন্য শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে তার ঢেউ স্বভাবতই বাংলাদেশেও এসে লেগেছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়: সারা পৃথিবী যে হারে এগোচ্ছে আমরা কি তার সঙ্গে তাল রেখে এগোতে পারছি, নাকি ক্রমেই আরো বেশি করে পিছিয়ে পড়ছি? সবার জন্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সব প্রধান সমস্যা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তার দু' চারটির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়:

ক. **প্রাথমিক শিক্ষা নিম্নমানের :** দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শ্রেণীকক্ষ নেই; যা আছে তারও জরাজীর্ণ অবস্থা। শিক্ষার্থীসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট শিক্ষক নেই; শিক্ষকদের উপস্থিতি অনিয়মিত, পাঠদান প্রায়শ অনাকর্ষণীয়। বিদ্যালয়ের পরিদর্শন নিয়মিত নয়; বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাও জনবিচ্ছিন্ন। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সংস্কার ও উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

খ. **উপস্থিতি কম, ঝরে পড়ার হার বেশি :** সাম্প্রতিক কিছু কিছু জরিপে দেখা যায় সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে উপস্থিতির হার মাত্র ৫০ বা ৬০ শতাংশ; শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হারও প্রায় এরকমই। অথচ অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বিদ্যালয়ে উপস্থিতি শতকরা ১০০ ভাগের কাছাকাছি, ঝরে পড়ার হার প্রায় শূন্য। বলা বাহুল্য, সুষ্ঠু শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষাক্রম, শিশুকেন্দ্রিক আকর্ষণীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক-অভিভাবক সুসম্পর্ক এ সবই এর মূল কারণ।

গ. **শিক্ষাক্রম নানা ভাষার ভারে ভারাক্রান্ত :** সম্প্রতি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের কিছুটা সংস্কার করে তাকে আরো জীবনমুখী ও ব্যবহারিক করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নানা ভাষার বোঝা আগের মতোই রয়েছে। প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় না, তাদের জন্য অহেতুক ভাষার বোঝা কেবল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের পথে বাধাই হয়ে দাঁড়ায়। ভাষার বোঝা কমিয়ে শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জনের ওপর আরো জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ঘ. **শিক্ষাদান পদ্ধতি গতানুগতিক :** আমাদের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা প্রাণহীন, অনাকর্ষণীয় ও মুখস্থনির্ভর। তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ক্ষীণ এবং তাতে শিক্ষার্থীদের মেধা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা সামান্য। কিছু কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এগুলোর সফল ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ঙ. **বয়স্ক শিক্ষার আয়োজন নিতান্ত সামান্য :** দেশে যে বিপুল সংখ্যক বয়স্ক নিরক্ষর রয়েছে তাদের সাক্ষরতা দেবার আয়োজন অতি সামান্য; যেটুকু ব্যবস্থা আছে তাও অনেক ক্ষেত্রেই দায়সারা গোছের। এসব বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের কাজের ফলাফল কি হচ্ছে তার মূল্যায়নের ব্যবস্থাও খুব দুর্বল। বয়স্ক শিক্ষার বিস্তারের জন্য দেশব্যাপী যে গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়োজন তা এখনও হয়ে ওঠে নি।

চ. **নব্যসাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ নেই** : দেশের বেশির ভাগ মানুষ আজ পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার শেষে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। বয়স্ক সাক্ষরতার যে সব কর্মসূচি চালু আছে তার মেয়াদ মূলত ছ'মাস থেকে দু'বছর। এতে যে প্রাথমিক সাক্ষরতা অর্জিত হয় তা অনেক ক্ষেত্রে চর্চার অভাবে পরে হারিয়ে যায়। এই সাক্ষরতা কাজে লাগিয়ে জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের জন্য নানা ধরনের স্বশিক্ষার উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এ ধরনের উপকরণের আজ নিদারুণ অভাব। দেশে গণপাঠাগারের সংখ্যা অতি নগণ্য; কাজেই শিক্ষা লাভে কারো আগ্রহ থাকলেও সে আগ্রহ মেটাবার সুযোগ খুবই সীমিত।

ছ. **শিক্ষার জন্য সম্পদ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত** : গত এক দশকে দেশে শিক্ষার জন্য সম্পদ বরাদ্দের হার কিছুটা বেড়েছে। তবে এখনও এই ব্যয় মোট জাতীয় আয়ের মাত্র দু'শতাংশের মতো। আমাদের প্রতিবেশী সব দেশ শিক্ষাখাতে এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাখাতে গড় ব্যয় চার শতাংশের ওপরে। কাজেই শিক্ষা খাতে এত কম ব্যয় করে আমাদের অগ্রগতির ধারা যে অতি মন্থর হবে তা আর বিচিত্র কি?

এসব সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে আমরা এযাবৎকালের অগ্রগতিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোন সুযোগ দেখি না। গত ক'বছরে যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে তাতে আশা হয় যে, ভবিষ্যতে এর বেগ আরো ত্বরান্বিত হবে। তবে আজ অগ্রগতির যে হার আগামী দিনে তা আরো বহুগুণে বাড়ানো না গেলে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থায়ী রূপান্তর আনা দুঃসাধ্য হবে।

একুশ শতকের দিকে

আজ আর সন্দেহ নেই যে, আগামী দিনের সমাজ হবে মূলত বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর। এককালে মানুষ প্রকৃতি থেকে খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করত তাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। ক্রমে ক্রমে মানুষ প্রকৃতির নানা নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে শিখেছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে নতুন নতুন বস্তুসামগ্রী তৈরি করতেও শিখেছে। এভাবে সৃষ্টিশীল প্রতিভার সাহায্যে সে প্রকৃতির সম্পদকে বাড়িয়ে তুলতে পেরেছে, আর নিজের জীবনকে করে তুলেছে আরো ঐশ্বর্যময়, আরো তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের পশ্চাদ্‌পদতার একটি বড় কারণ হল আমরা পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যেটুকু আহরণ করেছি তা মূলত হয় ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে অথবা ধার করা বিদ্যা

হিসেবে; এক্ষেত্রে চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন অবদান তেমন রাখতে পারি নি। ভাষা আন্দোলনের একটি অভীষ্ট ছিল এই যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পথ অবারিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ জগৎ সভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু এই অভীষ্ট অর্জনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল গত কয়েক দশকে তা কখনোই হয়ে ওঠে নি। ফলে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা আজ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়ার মতো। এজন্য যত বই-পুথি তৈরি করা প্রয়োজন তার অর্ধেকও এযাবৎ তৈরি করা যায় নি। বিদেশি যেসব গবেষণামূলক বই বা পত্র-পত্রিকা ক্রমাগত বাংলায় অনূদিত হওয়া প্রয়োজন তার অতি ক্ষুদ্রাংশও আজো হচ্ছে না।

উচ্চ শিক্ষার স্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পথ যে তেমন প্রশস্ত হয় নি তার একটি মারাত্মক ফল হয়েছে এই যে, আমাদের তরুণ সমাজ আজ আর ডিগ্রি স্তরে বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী হচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে ডিগ্রি পর্যায়ে মোটামুটি ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান পড়ত, আজ বিজ্ঞান পড়ছে পাঁচ শতাংশের নিচে। গত (১৯৯৪) ডিগ্রি পরীক্ষায় মোট ১,৮৭,০০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৯,০০০ জন বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। এর আগের বছরও এই হার পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। সমগ্র পৃথিবী যখন ক্রমেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছে তখন বাংলাদেশের যুব সমাজের এই বিজ্ঞানবিমুখতা জাতীয় অগ্রগতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে না হয় বাংলা বইয়ের অভাবের প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানবিমুখতার সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাতেও। আমাদের দেশের সকল শিক্ষা কমিশনই সুপারিশ করেছিল বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন এবং এজন্য প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার উল্টো। আশির দশকের শেষে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ কিছুটা বাড়লেও আজ সে সুযোগ কমে আসছে। নব্বই-এর দশকের শুরুতে (১৯৯১) মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় ৪৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী বিজ্ঞান-বিভাগে পরীক্ষা দেয়; বিজ্ঞান ধারার শিক্ষার্থীর এই হার কমতে কমতে ১৯৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে। বিজ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজের স্বাভাবিক আকর্ষণ সত্ত্বেও শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গত অবস্থার কারণেই তারা আজ বিজ্ঞান শিক্ষায় এমন অনাগ্রহী হয়ে উঠছে।

এত সব সত্ত্বেও আমরা নিরাশাবাদী নই। আমরা জানি নানা সমস্যার মধ্যেও পৃথিবী আজ বিপুল বেগে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গত

পঞ্চাশ বছরে বহু দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছে, মানুষের গড়পড়তা আয়ু ৪৬ বছর থেকে বেড়ে ৬৬ বছর হয়েছে। সারা পৃথিবীতে মানুষের গড়পড়তা মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিনগুণ, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, সাক্ষরতার হার বেড়েছে, নারী-পুরুষ বৈষম্য কমেছে, চারদিকে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ঘটেছে। এই সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণের ওপর বাড়লেও তার সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য উৎপাদন বাড়ার ফলে মানুষের গড় পুষ্টিমান বেড়েছে। ইতোমধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পাশ্চাত্য দেশে সীমাহীন ভোগের কারণে পরিবেশের বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে, কিন্তু মানুষ সে সবের প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত পথেরও সন্ধান পেয়েছে।

এই অর্ধ শতাব্দী সময়ের মধ্যে বাংলাদেশেও অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। শিক্ষার হার বেড়েছে, গড়পড়তা আয়ু বেড়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে অর্থাৎ কিছুটা হলেও মানুষের গড় জীবনমান বেড়েছে। এই বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ মানুষের মনে নতুন প্রত্যাশারও সৃষ্টি করেছে। এদেশের মানুষ আর পৃথিবীর জনসমাজে সব চাইতে পেছনের সারিতে থাকতে চায় না। তারা আরো শিক্ষা চায়, তাই তারা দলে দলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করছে। তারা কাজ চায়, দেশের উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে চায়। অথচ বিদ্যালয়ে তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান হয় না, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নেই, শিক্ষা গ্রহণ করে বেরোলে তরুণদের জন্য কাজের সংস্থান নেই।

আজ আমাদের সামনে তাই এক পবিত্র দায়িত্ব আমাদের মাতৃভাষার সম্পদকে এদেশের সব মানুষের কাছে অবারিত করা, শিক্ষার সুযোগ সারা দেশে ব্যাপ্ত করা। দেশের মানুষকে দ্রুত এক সাক্ষর সমাজে পরিণত করার মধ্য দিয়েই কেবল এ দায়িত্ব সম্পাদন করা যেতে পারে। আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য মানুষের কাছে লভ্য হতে পারে, দেশজোড়া মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার আলোক বিচ্ছুরিত হতে পারে কেবল মৌলিক শিক্ষা লাভের মাধ্যমেই। সাক্ষরতা ও গণশিক্ষার আন্দোলনকে তাই আজ এক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে হবে; তার মধ্যেই রয়েছে অমর একুশে পালনের প্রকৃত সার্থকতা।

আজ যখন আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবন নানা মত ও নানা পথে খণ্ডিত, তখন অমর একুশে এমন একটি উপলক্ষ যেখানে আমরা এখনও হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারি। মানুষের কাছে সাক্ষরতা ও মৌলিক শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াও এমন এক দায়িত্ব যেখানে সমগ্র জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দল-মত-নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সাক্ষরতার অভিযানে। একুশকে সামনে রেখে আগামী একুশ শতকের জন্য এক বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা উপহার দিতে পারি একটি বিজ্ঞানমনস্ক সাক্ষর সমাজ।

একুশের শহীদরা আমাদের মনে এই আশা জ্বালিয়ে রেখেছেন যে, দেশের সামনে আজ যে সব সমস্যা রয়েছে তার বেড়াজাল আমরা ভাঙতে পারব, এদেশের মানুষের আত্মবিকাশের পথ আমরা তৈরি করতে পারব। তাদের সেই আরব্ধ কাজ আমাদের সামনে। আমাদের ভাষা আমাদের কাছে পবিত্র, তেমনি পবিত্র আমাদের মানুষ আর তাদের জীবন। এই মানুষদের জীবনকে আমাদের উঁচুতে তুলে ধরতে হবে। এই মানুষকে পরিণত করতে হবে সম্পদে। যে মানুষের সম্বন্ধে এদেশের কবি বলেছেন, "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই মানুষদের জন্য যেদিন সুন্দর জীবন নিশ্চিত করা যাবে, ভাষার অধিকার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে যেদিন তাদের জীবন আলোকিত হবে সেদিনই কেবল একুশের শহীদদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।

শিক্ষার উপানুষ্ঠানিক ধারা

বাংলাদেশ তার জন্মের সময় থেকেই নানা কারণে আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এসব কারণের মধ্যে প্রথমত ছিল এদেশের মানুষের অসমসাহসিক মুক্তিযুদ্ধ; সারা বিশ্ব তাকিয়ে দেখেছে কিভাবে দীর্ঘদিনের শোষণ, অবিচার, নির্যাতনপীড়িত একটি দেশের অর্ধভুক্ত মানুষেরা নারী-পুরুষ-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মরণপণ স্বাধীনতার যুদ্ধে। তারপর দৃষ্টি পড়ল এদেশের দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, সাইক্লোন, সামরিক শাসন, গণতন্ত্রের সংগ্রাম এসবের জন্য। সাম্প্রতিক কালে প্রাধান্য পেয়েছে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এদেশের মানুষের লড়াই, সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন, শিশুমৃত্যু প্রতিরোধ ও সুপেয় পানি সরবরাহ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী অধিকার ও প্রগতি—এধরনের বিষয়গুলো। অবশ্য আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের মতো সুসংবাদের পাশাপাশি প্রচারিত হচ্ছে কিছু কিছু দুঃসংবাদ; নারী সমাজের প্রগতির লড়াইয়ের ওপিঠেই আছে তাদের দুর্গতির বিবরণ, শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক আন্দোলনের পাশাপাশি আলোচিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নিম্ন মান।

সবার জন্য শিক্ষার ব্যাপারটিই বিবেচনায় নেওয়া যাক। ১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা'-র মূলমন্ত্র নিয়ে যে জমতিয়েন সম্মেলন হয়ে গেল তার পর থেকে আরো অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে যেমন এগিয়ে এসেছেন সরকার তেমনি এগিয়ে এসেছে নানা পর্যায়ের অসংখ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। তার ফলে গত ক'বছরে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রায় নাটকীয় অগ্রগতি ঘটেছে। এসবই আশাব্যঞ্জক সুসংবাদ।

[আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধের রূপান্তর]

শিক্ষার দুই ধারা

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে সব রূপান্তর ঘটেছে তাদের মধ্যে প্রধান দু'টি হল: আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বের স্বীকৃতি; আর দ্বিতীয়ত সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি অনেকগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ব্যাপক আকারে শিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন।

আজ আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেখা যাচ্ছে শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আজকের দিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সব মানুষের শিক্ষার চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারছে না; সেজন্যই আধা-আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। উন্নত দেশে সকল নাগরিককে প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা মূলত আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়; শুধু মৌলিক শিক্ষার অতিরিক্ত যে জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন তার আয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা খুব অপর্যাপ্ত বলেই প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা—এমনি নানা ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা কথাগুলোর কিছুটা ব্যাখ্যা এখানে দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন। এই ধারায় নির্দিষ্ট স্কুল ভবনে, বিধিবদ্ধ উপকরণের সাহায্যে প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারায় শিক্ষার্থীর চাহিদা, বাস্তবতা, আকাঙ্ক্ষা এসবের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বেশি গুরুত্ব পায়।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষার ধারা তাকে বলা যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এই শিক্ষা উদ্দেশ্য, অভীষ্টজন ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ভিন্ন। মূলত নির্দিষ্ট বয়সের যারা নানা কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে নি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি কম, শিক্ষাক্রম অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ। এদেশে উপানুষ্ঠানিক ধারার

শিক্ষায় বয়স অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ভাগে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে:

ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (৬-১০ বছর বয়স পর্যন্ত)

খ. উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী শিক্ষা (১১-১৪ বছর বয়স পর্যন্ত)

গ. উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা (১৫-৩৫ বছর বয়স, কোথাও ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত)

- অব্যাহত শিক্ষা : অব্যাহত শিক্ষা মূলত শিক্ষার মৌলিক বা প্রাথমিক পর্যায়ের ধারাবাহিকতা। মৌলিক শিক্ষা লাভের পর অর্জিত শিক্ষাকে ধরে রাখতে হলে বা তাকে আরো বিকশিত করতে হলে শিক্ষার্থীদের জন্য যে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন তাকে অব্যাহত শিক্ষা বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কোন ব্যক্তি যদি শিক্ষাচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে সে তার অর্জিত শিক্ষা ভুলে যাবে। এই বাস্তবতা থেকে অব্যাহত শিক্ষার ধারণা এসেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা স্বভাবতই অব্যাহত শিক্ষার একটি রূপ। আজ বোঝা যাচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমেও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে ১৯৮০ সালে একটি উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তা অল্পদিন পরই বন্ধ হয়ে যায়। আবার ১৯৮৭ সাল থেকে প্রকল্প আকারে প্রথমে গণশিক্ষা কর্মসূচি নামে এবং তারপর ১৯৯২ সালে নাম পালটে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে এধরনের কর্মসূচি চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছুটা সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এবং কিছুটা নানা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নামে প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে । এভাবে ১৯৯২-৯৫ সময়কালে প্রায় দশ লাখ শিশু ও কিশোর-কিশোরী আর ছ'লাখ বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। এছাড়া লালমনিরহাট জেলার প্রায় আড়াই লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার জন্য একটি সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ১৯৯৫ সালে সম্পন্ন হয়েছে।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি দেশে অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করেছে। এসব সংস্থার উদ্যোগে গত দু'যুগে প্রায় পঞ্চাশ লাখ শিশু-কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রায় ছাব্বিশ লাখ শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক এসব সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগই রয়েছে শিশুদের জন্য তিন বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে; মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বয়স্কদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে। শুধু শিশুদের হিসেবটিকে যদি নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে দেশে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় যত ছেলেমেয়ে পড়ছে তার প্রায় এক-দশমাংশ পড়ছে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায়। যেহেতু আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি থেকে ঝরে পড়ার হার

খুব বেশি, তাই আগামী বহু দিন পর্যন্ত নতুন নতুন নিরক্ষর মানুষ তৈরি হতেই থাকবে এবং উপানুষ্ঠানিক সাক্ষরতা কর্মসূচির প্রয়োজন বাড়বে বই কমবে না।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

এদেশের বিগত শতাব্দীকালের শিক্ষাব্যবস্থার যেসব প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি প্রধান দিক হল বিদ্যাচর্চার প্রতি এক ধরনের ঐতিহ্যগত অনুরাগ (উনিশ শতকের শুরুতেই উইলিয়াম অ্যাডাম বঙ্গদেশে প্রায় এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হদিস পান) এবং মূলত বেসরকারি উদ্যোগে নানা ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রের ওপর সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব বর্তায় এবং সরকার দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় শুধু সরকারের পক্ষে দেশের সব শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠছে না; ফলে দেশে অনেক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে, অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও তাদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। এভাবে দেশে চার শ'র বেশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করেছে।

এদেশে নানা ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন প্রধানত স্থানীয়ভাবে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, তেমনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যও কিছু বেসরকারি উপানুষ্ঠানিক উদ্যোগ এদেশে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। তবে সংগঠিতভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম প্রধানত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে শুরু হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে দেশে যে ব্যাপক গণজাগরণ ও জনগণের মুক্তির প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়, তা-ই ছিল এসব উদ্যোগের মূল ভিত্তি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধকালেই কুড়িগ্রামের রৌমারি থানায় 'বাংলাদেশ বয়স্ক সাক্ষরতা সংসদে'র উদ্যোগে বয়স্ক শিক্ষা অভিযান শুরু করা হয়। এরই জের ধরে পরবর্তীকালে (১৯৭৩) রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলন ও ঠাকুরগাঁর কচুবাড়ি কৃষ্ণপুর গ্রামের স্বল্পস্থায়ী 'টিপসই ছি ছি' আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই কিছু কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ত্রাণ সাহায্য ও গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতা বিস্তারের কর্মসূচিও গ্রহণ করে। এদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেয় ব্র্যাক, আরডিআরএস, সিসিডিবি, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, জাগরণী চক্র, আশা ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ। সত্তরের দশকের শেষভাগে এসব কাজ ব্যাপক সংগঠিত রূপ নিতে আরম্ভ করে। আশির দশকে আরো কিছু নতুন উন্নয়ন সংস্থার আবির্ভাব ঘটে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এফআইভিডিবি, ভিইআরসি, জিএসএস, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, গণশিক্ষা-ডানিডা ও এসএনএসপি।

সত্তরের দশকে কোনো কোনো উন্নয়ন সংস্থা ছোটখাটো আকারে শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমও আরম্ভ করে; তবে এক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ গড়ে ওঠে আশির দশকে। এ ধরনের উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেয় ব্র্যাক, কারিতাস, গণশিক্ষা-ডানিডা ও জিএসএস। এসব উদ্যোগ প্রধানত দু'তিন বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১১-১৭ বছর বয়সীদের জন্য কিশোর-কিশোরী শিক্ষার রূপ নেয়। এছাড়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিও শুরু করে। আশির দশকে এসব প্রতিষ্ঠানের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল এই তিন ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি। এই ভিত্তিভূমির ওপরে নব্বই-এর দশকে এধরনের কার্যক্রম আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এই দশকে প্রশিকা ও আরো বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি আরম্ভ করে; ব্র্যাক তার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি দ্রুত সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি এবং সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের সহায়তা বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাকে বড় আকারের কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই দশকের শুরুতে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থার সাক্ষরতা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য 'গণসাক্ষরতা অভিযান' নামে নতুন একটি সংস্থা গড়ে ওঠে।

নানা ধারার কর্মসূচি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে তাকে প্রধানত দু'টি ধারায় ভাগ করা যায় : সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও সহায়তা কার্যক্রম। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় পড়ে নানা বয়ঃসীমার জনগোষ্ঠীর জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রম। এক্ষেত্রে তিনটি বয়ঃগোষ্ঠীকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়ে থাকে:(১) শিশু সাক্ষরতা (৪-১০+), (২) কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা (১১-১৭) ও (৩) বয়স্ক সাক্ষরতা (১৫-৩৫+)।

ক. *সম্প্রসারণ কার্যক্রম* : সম্প্রসারণ কার্যক্রম হতে পারে শিশুদের, কিশোর-কিশোরীদের বা বয়স্কদের জন্য।

১. **শিশু সাক্ষরতা** : এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। যেমন ক. *প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা* : ৪-৫ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলার জন্য এই কর্মসূচির মেয়াদ সাধারণত ৬-১২ মাস; আনন্দদায়ক খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তোলাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। খ. *উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা : প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণী*: এধরনের শিক্ষার মেয়াদ দু'বছর। ছ'-সাত বছরের শিশুদের এই শিক্ষার শেষে

আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি প্রভৃতি সংস্থার এজাতীয় কর্মসূচি রয়েছে। গ. *উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রথম-তৃতীয় শ্রেণী (৬-৮ বছর):* যে সব শিশু প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় নি তাদের ভর্তি করা হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ শিশুরা নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। এফআইভিডিবি, গণসাহায্য সংস্থা, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন প্রভৃতি সংস্থার এজাতীয় কর্মসূচি রয়েছে। ঘ. *উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রথম-তৃতীয় শ্রেণী (৮-১০ বছর)* : নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় নি বা ভর্তি হয়ে গোড়াতেই ঝরে পড়েছে এমন আট বছর বয়সী শিশুদের ভর্তি করা হয়। তিন বছরের শিক্ষাক্রম শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। ব্র্যাক, প্রশিকা, আরডিআরএস, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন –এসব সংস্থার এ ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। ঙ. *উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা: প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী* : মূলধারার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান্তরাল পুরো পাঁচ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম রয়েছে কারিতাস, জিএসএস, আরডিআরএস, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থার। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই ৬-১০ বছর। চ. *প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা* : কোনো কোনো উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের মৌলিক বিদ্যালয়। এসব বিদ্যালয়ে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে বুনিয়াদি শিক্ষার পর তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীতে প্রযুক্তিকেন্দ্রে ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আরো দৃষ্টান্ত হল ইউসেপ পরিচালিত প্রথম-সপ্তম শ্রেণীর এবং টিডিএইচ-এর প্রথম-পঞ্চম শ্রেণীর নৈপুণ্যবিকাশী কর্মসূচি।

২. কিশোর-কিশোরী সাক্ষরতা : এই কার্যক্রমের আওতায়ও নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। যেমন ক. *উপানুষ্ঠানিক কিশোর-কিশোরী কার্যক্রম* : সংস্থাভেদে ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের জন্য দু'বছরের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। এই শিক্ষাক্রমের শেষে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর সমমানের দক্ষতা অর্জন করে। খ. *বিবাহযোগ্য বালিকা শিক্ষাক্রম* : এই শিক্ষাক্রমে ১৫-১৭ বছর বয়সী বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি আইন শিক্ষা দেওয়া হয়। আরডিআরএস এ ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে। গ. *স্বাস্থ্য সাক্ষরতা কার্যক্রম* : ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় ১৫-২০ বছর বয়সী কিশোরীদের জন্য এই কর্মসূচি চালু হয়েছে। এতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

হাতেনাতে শিক্ষার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অন্য কিশোরী প্রশিক্ষণার্থীকে অন্তত তিন বছর স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা দিতে হয়।

৩. **বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম :** স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর শিক্ষা কর্মসূচির অন্যতম অংশ হল বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রম; তার সময়সীমা সংস্থাভেদে ৩-১২ মাস। মেয়াদের তারতম্য অনুসারে বয়স্কদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাতেও ভিন্নতা ঘটে। সাধারণত ১৫-৩৫ বছর বয়সের নারী-পুরুষ এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কার্যক্রমের ব্যয় মূলত আয়োজক সংস্থাই বহন করে। কোথাও কোথাও (যেমন প্রশিকায়) গণসংগঠনগুলো সদস্যদের উপকরণ ব্যয়ের দায়িত্ব নেয়; অন্যান্য ব্যয়ের দায়িত্ব আয়োজক সংস্থার। সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ সম্পূর্ণভাবে নারীদের দ্বারা পরিচালিত নারীকেন্দ্রিক বিষয়ে বিশেষ ধরনের সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও অন্যান্য কিছু সংস্থা নারীদের জন্য সাক্ষরতার পাশাপাশি নানা ধরনের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিছু সংস্থা সরাসরি সাক্ষরতা শিক্ষার বদলে বয়স্কদের জন্য সচেতনতা সঞ্চারমূলক কার্যসূচি গ্রহণ করে; যেমন ব্র্যাক, জিএসএস, আরডিআরএস প্রভৃতি।

খ. *সহায়তা কার্যক্রম* : সম্প্রসারণ কার্যক্রম ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচির দ্বিতীয় প্রধান দিক হল সহায়তা কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমও নানামুখী, যথা :

১. **শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন :** কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুনিয়াদি শিক্ষার উপকরণ (প্রাইমার বা শিক্ষার্থী সহায়িকা, চার্ট, পিকচার কার্ড, পোস্টার ইত্যাদি) এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করে। কোন কোন সংস্থা উন্নত মানের সাক্ষরতা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে (ব্র্যাক, আরডিআরএস, এফআইভিডিবি, জিএসএস, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন)। কিছু সংস্থা করেছে শিশু শিক্ষার উপকরণ (ব্র্যাক, জিএসএস ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন), আবার কিছু করেছে কিশোর-কিশোরী শিক্ষার ও অনুসারক শিক্ষা উপকরণ (ব্র্যাক, এফআইভিডিবি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ভিইআরসি)।

২. **সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ সহায়তা :** অনেক স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা সাক্ষরতা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। তারা নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিজ সংস্থা এবং অন্য সংস্থার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালায়। এরকম সংস্থার সংখ্যা পঞ্চাশের ওপরে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা দেড় শ'র কাছাকাছি। যেসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছে তৃণমূল কর্মী প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান কর্মী প্রশিক্ষণ, কারিগরি কর্মী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

৩. **উপকরণ সরবরাহ কার্যক্রম :** সাক্ষরতা কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন সংস্থাগুলোকে শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সহায়তা করাই এর উদ্দেশ্য। গণসাক্ষরতা অভিযান, এফআইভিডিবি প্রভৃতির এজাতীয় কর্মসূচি আছে।

৪. **আর্থিক, কারিগরি, ব্যক্তিগত ও অব্যাহত শিক্ষা সহায়তা :** কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অন্যান্য স্থানীয় বা তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বা বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে; ব্যাক প্রভৃতি সংস্থা সাক্ষরতার সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা অর্জন বা মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কারিগরি সাহায্য দেয়; বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি (বেইস) সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বা শিক্ষা ঋণ দেয়; আবার কোন কোন সংস্থা সাক্ষরতা কর্মসূচির ফলাফলকে ধরে রাখা ও পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি শুরু করেছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠা স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাক্ষরতা কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সত্তর ও আশির দশকে বেশ কিছু সংস্থা এক্ষেত্রে যে নানামুখী কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিল সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগের সমস্যাটি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই উপলব্ধি থেকে জমতিয়েন 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের সাক্ষরতা কর্মসূচিসম্পন্ন কয়েকটি প্রধান বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্মিলিত জোট হিসেবে 'গণসাক্ষরতা অভিযান' প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের সাক্ষরতা কার্যক্রমের প্রায় নব্বই শতাংশ পরিচালিত হয় এই জোটের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে। প্রতিষ্ঠার সময় গণসাক্ষরতা অভিযানের মূল লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ছিল :

১. এই শতাব্দীর মধ্যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সাক্ষর করে তোলা,

২. সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলনকে সফলতার পথে নিয়ে যাওয়া,

৩. প্রাকৃতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি,

৪. স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূল্যবোধ সঞ্চার,

৫. জাতীয় সাক্ষরতা আন্দোলনের জন্য সব রকম গণতান্ত্রিক শক্তি ও জোটের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি,

৬. মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্থবহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সাক্ষরতা ও শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রচার, জনসচেতনা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ; সাক্ষরতা কর্মসূচি বিস্তারের লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহের ক্ষমতার উন্নয়ন; আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, উপকরণ প্রণয়ন ও প্রকাশনা, সাক্ষরতা কর্মী উন্নয়ন ও সাক্ষরতা কর্মসূচির মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ।

গণসাক্ষরতা অভিযান ১৯৯২-৯৫ সালের একটি ত্রিবর্ষী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার প্রধান প্রধান দিক ছিল গবেষণা কার্যক্রম ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষক, নীতি-নির্ধারক ও সচেতন নাগরিকদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা; গণসাক্ষরতার অভিযানে দেশের সকল স্তরের নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবীসহ ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠিত করা; ধারাসৃজনী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংগঠন; পাঠাগার উন্নয়ন ও নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ, তৃণমূল ও স্থানীয় পর্যায়ের কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কারিগরি ও বস্তুগত সহায়তা দান এবং সে উদ্দেশ্যে তাদের কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। স্থানীয় পর্যায়ে সর্বাত্মক সাক্ষরতা কর্মসূচির মডেল হিসেবে রংপুরের উলিপুর থানার গুনাইগাছ ইউনিয়নে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগে একটি সমন্বিত সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে নানা বয়সের প্রায় ৮,০০০ মানুষ অংশ গ্রহণ করে; তাদের মধ্যে সমাপনী পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের ওপর উত্তীর্ণ হয়। ভবিষ্যতের কর্মসূচিতে এই সংস্থা সরকারি-বেসরকারি ও আনুষ্ঠানিক-উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যে অধিকতর সমন্বয়, শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অব্যাহত শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

গণসাক্ষরতা উপকরণ : গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতি সম্বন্ধে যেসব জরিপ চালানো হয়েছে তাদের একটি হল সাক্ষরতা উপকরণ সম্পর্কে। তাতে দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর ব্র্যাক প্রথম সাক্ষরতা উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের উদ্যোগ নিতে আরম্ভ করে। এখন প্রায় ত্রিশটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা সাক্ষরতা উপকরণ তৈরি করছে। বয়স্কদের জন্য বিশেষ কার্যকর উপকরণ তৈরি করেছে ব্র্যাক, আরডিআরএস, এফআইভিডিবি, গণশিক্ষা-ডানিডা, জিএসএস, সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমও বয়স্কদের জন্য কিছু উপকরণ তৈরি করেছে। এসব উপকরণ ৬-১২ মাস সময়ে বাস্তবায়নের জন্য।

বেশ ক'টি সংগঠন শিশুদের জন্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে। তার মধ্যে ব্র্যাক-এর উপকরণ বিকল্প প্রাথমিক শিক্ষার একটি সফল ও কার্যকর উপকরণ বলে বিবেচিত হয়। মিশ্র উপকরণাদির সহায়তায় জিএসএস (নিজস্ব উপকরণসহ) একটি স্বতন্ত্র কার্যকর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির সূচনা করেছে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনও শিশুদের জন্য ভাল মৌলিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি করেছে। কিশোর-কিশোরীদের উপানুষ্ঠানিক বয়ঃসন্ধিক্ষণ শিক্ষার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একটি পৃথক উপকরণ প্রস্তুত করেছে। ব্র্যাকসহ বিভিন্ন সংগঠন শিশুদের জন্য প্রণীত উপকরণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমও কিশোর-কিশোরী উপকরণ রচনায় হাত দিয়েছে।

অব্যাহত শিক্ষার জন্য উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ এখনও তেমন বড় আকারে নেওয়া সম্ভব হয় নি। পঞ্চাশের দশকে এইচ জি এস বিভাগের নেতৃত্বে সেকালের 'বয়স্ক শিক্ষা সমিতি' প্রথম অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ তৈরির উদ্যোগ নেয়। এরপর ১৯৬৪-৬৭ সালে সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের বয়স্ক শিক্ষা শাখাও অব্যাহত শিক্ষার বেশ কিছু উপকরণ তৈরি করে। সম্প্রতি যেসব স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ তৈরি করেছে তার মধ্যে ব্র্যাক, এফআইভিডিবি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ভিইআরসি'র উপকরণ উল্লেখযোগ্য।

স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য

গত দু'দশকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশে সাক্ষরতা বিস্তারে এ ধরনের বেসরকারি উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিস্তার মূলত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হলেও বাংলাদেশে শিক্ষার সমস্যা যেমন ব্যাপক ও গভীর তাতে এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও সব গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া দুঃসাধ্য। আর তাই প্রাতিষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা আজ একটি স্বীকৃত রূপ নিয়েছে।

বিগত ক' বছরে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত এসব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার যেসব মূল্যায়ন হয়েছে তাতে দেখা যায় সাধারণভাবে এসব কর্মসূচির এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

- সনাতন ধারার শিক্ষাক্রমের তুলনায় এদের শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ;
- শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি উদ্ভাবনমূলক;

- বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি মনোরম ও আকর্ষণীয়;
- সামাজিক সম্পৃক্ততা ও সমর্থন বেশি হওয়ায় উপস্থিতি ও সমাপ্তির হার বেশি;
- প্রায়শ সাক্ষরতা কর্মসূচি আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বেশি ফলদায়ক;
- সাধারণত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নমনীয় সময়সূচি অনুসরণ করা হয়;
- মেয়েদের বেশি হারে উপস্থিতি দেখা যায়; এবং
- প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উপযোগী।

একটি জরিপে দেখা যায়, যেখানে নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার প্রায় ৪০ শতাংশ, সেখানে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালিত কর্মসূচিতে ৬-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে পড়ে মাত্র ৪.২ শতাংশ, ১১-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ১১.৫ শতাংশ, ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ১২.৯ শতাংশ এবং ২০-৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ১২.২ শতাংশ।

এসব শিক্ষা কর্মসূচিতেও অবশ্য এখনও যথেষ্ট উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে এবং সারা দেশে শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষার যে বিপুল প্রয়োজন সে তুলনায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কর্মোদ্যোগ এখনও অতিমাত্রায় সীমিত। কিন্তু বিগত দু'দশকের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এসব প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং আগামীদিনে সে অবদানের ব্যাপক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যয়: গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত জরিপের আরেকটি বিষয় ছিল উপানুষ্ঠানিক সাক্ষরতা কর্মসূচির মাথাপিছু ব্যয়। এ ধরনের শিক্ষার ব্যয় অনেকটা নির্ভর করে কোন্ বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা কর্মসূচি, সে কর্মসূচির সময়কাল ও ধরন, কি ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপরে। দেশের নানা অংশে এবং নানা সংস্থার মধ্যেও স্বভাবতই কিছুটা তারতম্য থাকবে। তাছাড়া যত শিক্ষার্থী কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদের ভিত্তিতে ব্যয়ের হিসেব এক রকম হয়, আবার ঝরে পড়া বাদ দিয়ে যতজন কর্মসূচি সমাপ্ত করে শুধু তাদের ভিত্তিতে হিসেব করলে কিছুটা বেশি হয়। এসব বিবেচনায় এনে নানা বয়ঃক্রমের কর্মসূচির জন্য গড়পড়তা হিসেব করা হয়েছে।

জরিপের ভিত্তিতে দেখা যায়, ৬-১০ বছর বয়ঃক্রমের শিশুদের শিক্ষার জন্য গড় বার্ষিক ব্যয় মাথাপিছু ৬৯১ টাকা; ঝরে পড়া শিশুদের বাদ দিয়ে হিসেব করলে এই অঙ্ক দাঁড়ায় বার্ষিক মাথাপিছু ৭৪০ টাকা। এক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। কিশোর-কিশোরী শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট ব্যয় দাঁড়ায় বার্ষিক মাথাপিছু ৭৬৩ টাকা;

ঝরে পড়া বাদ দিলে ব্যয় হয় বার্ষিক মাথাপিছু ৭৯৯ টাকা। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য সমগ্র কোর্সের ব্যয় স্থির করা হয়েছে; নারী-পুরুষের মধ্যে এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ব্যয়ের মধ্যে কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য মাথাপিছু ব্যয় যেখানে ৪৯৯ টাকা (ঝরে পড়াসহ), সেখানে মেয়েদের জন্য ৪২৯ টাকা। পুরুষদের জন্য সন্ধ্যায় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবার ফলে বাতি, তেল প্রভৃতির জন্য কিছুটা বাড়তি ব্যয় হয়। ঝরে পড়া বাদ দিলে পুরুষদের মাথাপিছু ব্যয় দাঁড়ায় মেয়েদের তুলনায় প্রায় ২৭% বেশি। সরকারি বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে (প্রশাসনিক ব্যয় বাদ দিয়ে) মাথাপিছু খরচ মোটামুটি ২৮১ টাকা, ঝরে পড়া বাদ দিলে এটা দাঁড়ায় ৩৪২ টাকা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

১৯৯২ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান একটি জরিপ চালিয়েছিল; তা থেকে জানা যায় তখন দেশে ৩২৬টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাজে জড়িত ছিল; তাদের মধ্যে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংগঠন ছিল ১৮৬টি, অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সংগঠন ছিল ১৪০টি। ১৯৯২ সালে প্রায় ৭.৬০ লাখ নারী-পুরুষ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করছিল। তার পর অবশ্য এসব কর্মসূচির বিস্তার আরো বেড়েছে। ১৯৯৫ সালে এমনি আরেকটি জরিপ চালিয়ে দেখা যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন করছে অন্তত ৪১৪টি সংস্থা। জরিপের তথ্য অনুযায়ী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করছে অন্তত ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী (তাদের মধ্যে প্রায় ৬৩ শতাংশ মেয়ে), বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করছে আরো প্রায় ৯ লক্ষ নারী-পুরুষ (তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী), আরো চার লাখের ওপরে রয়েছে কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রে। এই হিসেব কিছুটা অসম্পূর্ণ, কাজেই প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও হতে পারে।

বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে ২৬.৪৬ লাখ মানুষ; তাদের মধ্যে ১৩.৭৩ লাখ (অর্থাৎ ৫২ শতাংশ) শিশু, ৪.০৭ লাখ (বা ১৫ শতাংশ) কিশোর-কিশোরী, আর ৮.৬৬ লাখ (৩৩ শতাংশ) বয়স্ক মানুষ। এছাড়া এসময়ে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছিল প্রায় ৪ লাখ শিক্ষার্থী অর্থাৎ সব মিলিয়ে দেশে নানা ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লাখ; তাদের মধ্যে বেশির ভাগই শিশু-কিশোর এবং এক-তৃতীয়াংশ বয়স্ক মানুষ। আর এসবের মূল লক্ষ্য সাক্ষরতা ও বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব সারণি ৮-এ পাওয়া যাবে।

সারণি ৮ : বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তার (১৯৯৫)

সংখ্যাগুলো হাজারের অঙ্কে

শিশু (৫-১০ বছর)			কিশোর-কিশোরী (১১-১৪ বছর)			বয়স্ক (১৫-৩৫+ বছর)		
ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
৫০৯.৪	৮৬৩.৪	১৩৭২.৮	১৪৩.৬	২৬৩.৩	৪০৬.৯	১৭২.০	৬৯৪.০	৮৬৬.০
৩৭.১%	৬২.৯%	১০০%	৩৫.৩%	৬৪.৭%	১০০%	১৯.৯%	৮০.১%	১০০%

তথ্য : গণসাক্ষরতা অভিযান।

তবু এভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে আজ সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রতি বছর ২১ লাখের মতো শিশু-কিশোর এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচিতে ১৫-৩৫ বছর বয়ঃসীমার প্রায় ১১ লাখ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। অবশ্য যারা সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তাদের সবাই শেষ পর্যন্ত সাক্ষর হয়ে উঠবে না। শুধু বয়স্কদের সংখ্যা ধরলে দেখা যাবে দেশে ১৫+ বয়সের বয়স্ক নিরক্ষরের সংখ্যা চার কোটির ওপরে। আর যদি দশ লাখ বয়স্ক লোককেও প্রতি বছর সাক্ষর করে তোলা হয় তাহলে বর্তমান হারে চললে আজকের নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করে তুলতে অন্তত চল্লিশ বছর সময় দরকার।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাবে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আগেও ছিল, এখনও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যেসব ব্যাপক সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে দেখা যায় সেখানে জনগণের ব্যাপক স্বেচ্ছাসেবামূলক অভিযানের মধ্য দিয়ে সেসব সফল হয়েছে। এক্ষেত্রে তুরস্ক, সাবেক সোভিয়েতে ইউনিয়ন, কিউবা, তানজানিয়া, ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া এসব দেশের নাম করা যায়। আমরাও কি এধরনের একটি ব্যাপক অংশ গ্রহণমূলক সাক্ষরতা অভিযানের সূত্রপাত করতে পারি না?—এ সম্ভাবনার কথা আমাদের সবাইকে ভেবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের মতো। নানা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাতেও রয়েছে প্রায় ৭০,০০০ শিক্ষক-শিক্ষিকা। এঁরা সবাই প্রায় নামমাত্র সম্মানীতে নিবেদিতচিত্তে শিক্ষাদানের কাজ করে চলেছেন। তাছাড়া আমাদের মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা দেয় প্রায় আট লাখ ছেলেমেয়ে, উচ্চমাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা দেয় প্রায় চার লাখ; ডিগ্রি স্তরেও নানা ধরনের পরীক্ষা দেয় প্রায় দুলাখ। এদের সবাইকে পরীক্ষার পর ফল পাওয়া বা পরবর্তী স্তরে শিক্ষা শুরু করার আগে পর্যন্ত বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই যুবশক্তিকে কি আমরা শিক্ষাদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে পারি না?

সেই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বাহিনীর কথাও। যেসব সরকারি কর্মকর্তার হবার কথা পেশাগতভাবে জনগণের সেবক তাদের মধ্যে আগে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব ও অঙ্গীকার গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন। একই কথা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমরা কি আশা করতে পারি না যে, দেশের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ সাক্ষরতা কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে জনগণকে এই অতি জরুরি জাতীয় দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করবেন?

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানের কথা যেমন আমাদের বিবেচনা করতে হবে তেমনি তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মানের কথাও ভাবতে হবে। শিক্ষকই যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আজ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যে উন্নতমানের শিক্ষা দেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম নেই তা বলা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাই দায়িত্বসচেতন হয়েও নানা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে অতি সংক্ষিপ্ত সংযোগকাল, শিক্ষকস্বল্পতার কারণে শ্রেণীকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, ভারাক্রান্ত শিক্ষাক্রম ও নিরানন্দ শিক্ষাদান পদ্ধতি, যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণের সমস্যা, উপযুক্ত সহায়ক ও পরিপূরক উপকরণের অভাব, শিক্ষার অনুপযোগী ভৌত পরিবেশ ইত্যাদি। এসবেরও প্রতিকারের ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নেওয়া প্রয়োজন।

উদ্ভাবন ও স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা

বাংলাদেশ আজ যেসব জটিল সমস্যায় জর্জরিত তাদের মধ্যে অন্যতম হল অশিক্ষা। দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, জনবিস্ফোরণ এমনি অনেক সমস্যার সমাধানের জন্যই দ্রুত ও ব্যাপক গণশিক্ষার বিস্তার আজকের এক জরুরি জাতীয় প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ যে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর সারিতে স্থান পেয়েছে তারও একটি মূল কারণ এদেশের জনগণের ব্যাপক অশিক্ষা।

অশিক্ষার সমস্যাটি যে এদেশে সাম্প্রতিককালে দেখা দিয়েছে তা নয়। দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য ১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে অনেক আইন প্রণীত হয়েছে; দেশের সংবিধানে শিক্ষাকে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করে বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু তবু এখনও এদেশে দুই-তৃতীয়াংশ বয়স্ক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরক্ষর। শুধু তাই নয়, গ্রাম আর শহর, নারী আর পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। পুরুষদের তুলনায় নারীদের সাক্ষরতার হার অনেক কম।

এদেশে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত প্রায় সব শিক্ষায়তন মূলত বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে সরকার যখন শিক্ষার জন্য কিছুটা দায়িত্ব নেওয়া শুরু করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের ভূমিকা মূলত সীমাবদ্ধ থেকেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন, মান নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান প্রদানের মধ্যে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর সরকার সংবিধানে অর্পিত প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক

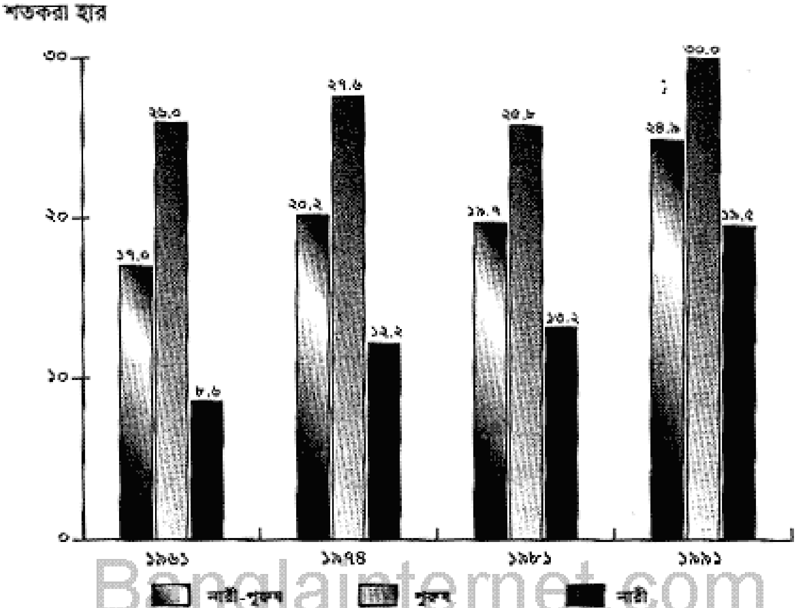
বিদ্যালয়কে একযোগে অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু তারপর গত দু'দশকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেই সংখ্যা তেমন আর বাড়ে নি, অথচ শিক্ষার্থীসংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৬৫ ছাড়িয়েছে এবং শিক্ষাদানের মান নিচে নেমে গিয়েছে।

এই জটিল শিক্ষা সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতেই সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের কর্মসূচি আরম্ভ করেছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও কিশোর-কিশোরী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি কর্মসূচিতে তাদের উদ্যোগ শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাইরেও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল স্তরেই আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, শিক্ষাক্রমের অনুপযোগিতা, শিক্ষাদানের অদক্ষতা, ব্যাপক হারে অকৃতকার্যতা এসব সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংবিধানের নির্দেশ এবং কয়েকবার আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও

চিত্র ৪ : বাংলাদেশে সব বয়সের নারী-পুরুষ মিলিয়ে সাক্ষরতার হার : ১৯৬১-৯১



সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, *আদমশুমারি রিপোর্ট* ১৯৯১, খণ্ড ১, ঢাকা: ১৯৯৪

স্বাধীনতা লাভের পর দু'যুগ পেরিয়ে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা যে এখনও সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নি, এটা সবচেয়ে দুঃখবহ ঘটনা। প্রাথমিক শিক্ষায় যে ধরনের দীর্ঘকালের অবহেলা ও পশ্চাদ্পদতা, তেমনি পশ্চাদ্পদতা রয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও। ১৯৯১ সালের বাংলাদেশের আদমশুমারির তথ্য থেকে যে চিত্র পাওয়া যায় তা সারণি ৯-এ দেখানো হল। এই সারণি থেকে দেখা যাবে ১৫ বছরের অধিক বয়স্ক জনসংখ্যা ৫.৮৩ লক্ষ আর তার মধ্যে নিরক্ষরে সংখ্যা ৩.৭৭ কোটি অর্থাৎ নিরক্ষরতার হার ৬৪.৭ শতাংশ; এই হার উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় হারের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রাথমিক পর্যায়ে যত ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় তার একটা বড় অংশ প্রতি শ্রেণীতেই ঝরে পড়তে থাকে। গত এক যুগে এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে; কিন্তু ১৯৯৫ সালেও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার ছিল অন্তত ৪০ শতাংশ। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে এই ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা ও গণশিক্ষার সমস্যা এমন সর্বব্যাপী, দীর্ঘকালীন ও বিশাল রূপ নিয়েছে যে, এর সমাধানের জন্য সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগকে সমন্বিত করে এক ব্যাপক জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন। জাতিসংঘ ১৯৯০ সালে জমতিয়েনে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে ডাক দিয়েছে ২০০০ সালের মধ্যে সারা দুনিয়ার প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার। এই পরিপ্রেক্ষিতেও বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষার

সারণি ৯ : বাংলাদেশে বিভিন্ন বয়ঃক্রমে নিরক্ষরতার হার

জনসংখ্যা হাজারের অঙ্কে

বয়ঃক্রম	মোট জনসংখ্যা	নিরক্ষর জনসংখ্যা			নিরক্ষরতার হার (%)		
		পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
৭-৯ বছর	১০,৫২২	৫,০২২	৪,৭৪২	৯,৭৬৪	৯২.৬	৯৩.০	৯২.৮
১০-১৪ বছর	১২,৯১৫	৪,১২৯	৩,৬৪৯	৭,৭৭৮	৫৯.৮	৬০.৭	৬০.২
১৫-১৯ বছর	৮,৯৩৩	২,১২৫	২,৪৬০	৪,৫৮৫	৪৬.৭	৫৬.১	৫১.৩
২০-৩৪ বছর	২৪,৪৬৪	৬,৩৫২	৮,৯৯৬	১৫,৩৪৮	৫৩.৯	৭০.৯	৬২.৭
৩৫+ বছর	২৪,৯২০	৮,১৮৭	৯,৬০০	১৭,৭৮৭	৬০.২	৮৪.৮	৭১.৪
মোট	৮১,৭৫৪	২৫,৮১৫	২৯,৪৪৭	৫৫,২৬২	৬১.১	৭৪.৫	৬৭.৬

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আদমশুমারি রিপোর্ট ১৯৯১, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪

আন্দোলন বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা জরুরি হয়ে উঠেছে। স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জমতিয়েন সম্মেলনেও শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে গত দু'দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে চার শ'র ওপর বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। তাদের কর্মসূচিতে ১৯৯৪ সালে ৭৩,০০০ কেন্দ্রে প্রায় ২৬ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করছিল। এদের মধ্যেই ১৪ লক্ষ ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু (তার ৬৩% মেয়ে), ৪ লক্ষ কিশোর-কিশোরী (৬৫% মেয়ে), আর ৮ লক্ষ বয়স্ক নারী-পুরুষ (৮০% নারী)।

সরকারের সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর হার ১৯৯১ সালের ৭৬ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে ৯৫ শতাংশে ওঠার কথা। শিক্ষা সমাপ্তির হার ৪০ থেকে বেড়ে হবার কথা ৭০ শতাংশ, আর বয়স্ক সাক্ষরতার হার বাড়বার কথা ৩৫ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে। বলা হচ্ছে, এর মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার ৯২ শতাংশে, শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬০ শতাংশে আর বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪২ শতাংশে উঠেছে।

দেশে বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর আর বয়স্ক রয়েছে শিক্ষা কর্মসূচির বাইরে; তাতে মনে করা হয় যে, অল্প খরচে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও ধরে রাখার নিশ্চয়তা দেয় আর শিক্ষা সমাপ্তিতে সহায়তা করে এমন উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিশাল আকার, অপর্যাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা, দুর্বল পরিদর্শনব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার কারণে তাতে কোন ধরনের উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ নেওয়া খুবই দুঃসাধ্য। সেক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা কর্মসূচি, বিশেষ করে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উদ্যোগে সারা দেশে চালু হয়েছে।

উদ্ভাবনমূলক শিক্ষার মডেল

শিক্ষাক্ষেত্রে কোন কর্মসূচিকে উদ্ভাবনমূলক বলা যায় যদি তা হয়: প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ও স্বল্পব্যয়সাধ্য; ফলাফল হয় পরিমাপযোগ্য এবং অন্যদের দ্বারা পরখযোগ্য; তার বিভিন্ন দিক হয় ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-সংবদ্ধ; পরিচালন ব্যবস্থা হয় সরল, অথচ দক্ষ এবং কর্মীদের মধ্যে থাকে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা। বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রে এধরনের কিছু উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের নমুনা উল্লেখ করা হল:

১. **ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম** : ব্র্যাকের এই কর্মসূচিতে ৮ থেকে ১০ বছর বয়সের এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের এমন সব ছেলেমেয়ের নেওয়া হয় যারা আগে নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় নি বা পেলেও অল্পদিনেই ঝরে পড়েছে। এই কর্মসূচি প্রথম থেকে তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর।

২. **গণসাহায্য সংস্থার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি** : এতেও যে সব ছেলেমেয়ে নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় নি তাদের ভর্তি করা হয়। প্রথম দিকে শুধু তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ছিল; এখন বাড়িয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত করা হচ্ছে। গণসাহায্য সংস্থা সাধারণত স্কুলের জন্য পাকা দালান নিজেরা তৈরি করে।

৩. **বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের কারিগরি বিদ্যালয়** : এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষা পায়; চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে তাদের বিজ্ঞান, পরিবেশ ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে শেখানো হয়। উদ্দেশ্য হল, ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

৪. **ইউসেপ স্কুল** : ৬-১৪ বছর বয়সী খেটে খাওয়া শিশুদের জন্য এই বিশেষ ধরনের স্কুলগুলো চালানো হয়। স্কুলের মেয়াদ সাত বছর। এতে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মিশেল ঘটানো হয়।

এসব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, খুব সামান্য সম্পদের সাহায্যেও নানা ধরনের উপকরণের ব্যবহার এবং উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে শিশুদের জন্য এমন আকর্ষণীয় শিক্ষা কর্মসূচি চালানো যায় যে, অনুপস্থিতি বা ঝরে পড়া প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

ব্র্যাক: জাতীয় ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাকই প্রথম ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করে। গ্রামের দরিদ্রদের জন্য একটি ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ব্র্যাকের যাত্রা ১৯৭২ সালে শুরু হলেও এর শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয় ১৯৮৫ সালে মাত্র ২২টি স্কুল নিয়ে। ১৯৯৬ সালে সারা দেশে ৫৯টি জেলায় ব্র্যাকের প্রায় ৩৫,০০০ উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে আর তাতে প্রায় ১১.৪ লক্ষ গরিব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখছে। ব্র্যাকের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি এই শিক্ষা সমাপ্ত করে আর প্রায় ৮০ শতাংশ নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়।

ব্র্যাক দু'ধরনের স্কুল চালায়: ৮-১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে যারা আগে স্কুলে যায় নি তাদের জন্য তিন-বছরের কর্মসূচি; আর ১১-১৪ বছর বয়সী যারা আগে স্কুলে ভর্তি হয়েও ঝরে পড়েছে এবং আর ভর্তির সম্ভাবনা নেই তাদের জন্য কিশোর-কিশোরী স্কুল। ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

- **শিক্ষার্থী**: প্রতি স্কুলে শিক্ষার্থী থাকে ৩০-৩৩ জন, তার মধ্যে ৭০ শতাংশের ওপর মেয়ে —এরা সবাই গ্রামবাসী, আর স্কুল থেকে দু'কিলোমিটারের মধ্যে বাস করে। এসব ছেলেমেয়ে এমন গরিব পরিবারের যারা হয় একেবারে ভূমিহীন অথবা যাদের বসত ছাড়া আর কোন জমি নেই।
- **শিক্ষক**: শিক্ষকেরা সাধারণত বিবাহিত এবং ঐ গ্রামের বাসিন্দা; ৯৫ শতাংশের বেশি নারী, যাদের অন্তত নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া আছে। শিক্ষকদের সাময়িক ও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তারা সামান্য ভাতা পায়। নির্বাচনের পর তারা কোন আবাসিক ব্র্যাক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ১২ দিনের প্রশিক্ষণ নেয়; তারপর প্রতি মাসে তাদের নিকটবর্তী কোন ব্র্যাক অফিসে এক বা দু'দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ নিতে হয়। বছরের শেষেও তাদের জন্য চারদিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ হয়। প্রতি সপ্তাহে ব্র্যাক মাঠকর্মীরা দু'বার তাদের কাজ পরিদর্শন করেন। একেকজন পরিদর্শক ১৫-১৬টি স্কুলের দায়িত্বে থাকেন; এসব পরিদর্শকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মেয়ে।
- **অভিভাবক**: সাধারণত শিক্ষার্থীদের বাবা-মা'রা নিরক্ষর এবং গ্রামের সবচেয়ে দুঃস্থ। স্কুলের জন্য তাদের বেতন দিতে হয় না, তবে স্লেট ভেঙে গেলে বা মাদুর ছিঁড়ে গেলে তারা বদলে দেয়। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যেমন পেন্সিল, খাতা, বই, শিক্ষকদের ম্যানুয়াল, স্লেট, চক, ব্ল্যাকবোর্ড এসব ব্র্যাক থেকেই সরবরাহ করা হয়। নতুন কোন স্কুল খোলার আগে সাধারণত ব্র্যাকের কর্মীরা বাবা-মাদের সঙ্গে বেশ ক'বার বৈঠক করেন। এছাড়া বাবা-মাদের তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাবার এবং মাসিক শিক্ষক-অভিভাবক সভায় যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়।
- **সময়সূচি**: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি তিন বছর মেয়াদে চলে। দিনে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা হিসেবে সপ্তাহে ছ'দিন (বছরে ২৬৮ দিন) স্কুল বসে —এমন সময়ে যেটা বাবা-মাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধেজনক। শুরুতে ৩০-৩৩ জন শিশুকে ভর্তি করা হয় এবং তারা এক শ্রেণী থেকে পরের শ্রেণীতে উঠতে থাকে। একটি চক্র শেষ হলে সেই এলাকায় যথেষ্ট শিক্ষার্থী পেলে আবার ৩০-৩৩ জন শিশু ভর্তি হয়। ছুটিছাটা নির্ধারিত হয় বাবা-মাদের সঙ্গে আলোচনা করে। শিক্ষকরা খুব কমই অনুপস্থিত থাকেন। ছাত্র-শিক্ষক হার কম বলে নাম ডাকার

জন্য বা শিক্ষকের এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাবার জন্য সময় নষ্ট হয় না। তাছাড়া শিক্ষকরা তেমন কোন বাড়ির কাজ দেন না, কাজেই বাড়ির কাজ দেখার জন্যও তেমন সময় যায় না। অন্যদিকে সরকারি স্কুল বসে দিনে দু' থেকে তিন ঘণ্টা, এক বা দু'শিফ্‌টে, চলে মাত্র ২২০ দিন। ক্লাসে থাকে ১০০ জন পর্যন্ত ছেলেমেয়ে, তাতে নাম ডাকতেই অনেকটা সময় চলে যায়। ব্র্যাকের স্কুলে সবটা সময় মূলত পড়াশোনায় ব্যয় হয়। ফলে বছরে পড়াশোনা হয় সাধারণত ৬৭০ থেকে ৮০৪ ঘণ্টা, যেখানে সরকারি স্কুলে হয় ৪৫০ থেকে ৬০০ ঘণ্টা।

- স্কুলঘর : স্কুল বসে একটি কামরায়। এটি দিনে তিন ঘণ্টা ব্যবহারের জন্য ভাড়া করা হয়। ব্র্যাকের ভাড়া করা স্কুল ঘরের আকার হয় অন্তত ২৪০ বর্গফুট; তার জন্য মাসে ভাড়া দেওয়া হয় মাত্র দু'শ' টাকা। এসব ঘরে সাধারণত দেয়াল বাঁশের বেড়া বা মাটির তৈরি, মেঝে মাটির, চাল টিনের। শিক্ষার্থীরা সাধারণত ঘরের তিনপাশে মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে বসে, তাদের কোলে থাকে স্লেট। তাদের সামনে থাকে ব্ল্যাকবোর্ড ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষকের জন্য থাকে একটি টুল আর একটি স্টিলের ট্রাঙ্ক; তাতে থাকে দরকারি জিনিসপত্র; সেটাকে লেখার ডেস্ক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব সাধারণত এক থেকে আড়াই কিলোমিটার, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য স্কুল কাছে হওয়াটা একটা বিরাট সুবিধে; এতে অভিভাবকরা নিরাপত্তা বোধ করেন, স্কুলে কি ঘটছে তা তদারকও করতে পারেন।
- শিক্ষাক্রম : উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল আর কিশোর-কিশোরী স্কুল দু'ধরনের বিদ্যালয়েই বিষয়গুলো অনেকটা সাধারণ প্রাথমিক স্কুলের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের মতো। ব্র্যাকের শিক্ষাক্রম গত ক'বছরে বেশ ক'বার সংস্কার করা হয়েছে; এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। গোড়ায় শিক্ষাসূচিতে ছিল কেবল বাংলা, গণিত আর সমাজ পাঠ। ১৯৮৭ সালের দিকে দেখা গেল ব্র্যাকের স্কুল শেষ করে অনেক ছেলেমেয়ে সাধারণ সরকারি স্কুলে পড়তে যেতে চায়; তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ইংরেজি আর ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাছাড়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের যে সব স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তার ওপরও জোর দেওয়া হয়। সময় ভাগ করা হয় মোটামুটি এভাবে: বাংলা (৩০ মিনিট পড়া ও ২০ মিনিট লেখা); গণিত (৩৫ মিনিট); সমাজপাঠ (৩৫ মিনিট); ৩০ মিনিট করে দু'বার খেলাধুলা, গান, নাচ, ছবি আঁকা এধরনের সহপাঠক্রমিক বিনোদনমূলক কাজ। তৃতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি আর ধর্মীয় শিক্ষা যোগ হয়। ব্র্যাকের শিক্ষাসূচিতে সরকারি শিক্ষাসূচির চেয়ে অনেক কম বিষয়বস্তু

থাকায় সেগুলো বেশ ভাল করে শেখানো সম্ভব হয়। শিক্ষাসূচির বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় ছোট ছোট পাঠে; বইগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট, সুমুদ্রিত ও আকর্ষণীয়। সব বইতেই দৈনন্দিন জীবন থেকে নানা উদাহরণ দিয়ে পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।

- **শিক্ষার পরিবেশ :** স্কুলে যে ৩০-৩৩ জন ছেলেমেয়ে থাকে তারা একই সঙ্গে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ওঠে। তাদের শিক্ষকও থাকেন একজনই। সরকারি স্কুলের তুলনায় শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বেশ কম (সরকারি স্কুলে মোটামুটি ৬৫:১)। ছেলেমেয়েদের অনেক সময় ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়; অগ্রসর শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়াদের সাহায্য করে। ব্র্যাকের শিক্ষাদানে মূলত শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সাফল্যের একটা কারণ হল গ্রামাঞ্চলে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম চালাবার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। ব্র্যাক শুরু থেকেই এমন সব জরিপের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যার সাহায্যে গ্রামের সবচেয়ে গরিব মানুষদের জন্য উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হয়। আর কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণ যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে এমন কতকগুলো পদ্ধতিও ব্র্যাক উদ্ভাবন করেছে।

বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ব্র্যাকের কর্মসূচির জন্য শিক্ষার্থীপিছু ব্যয়ের হিসেব করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় তাদের ব্যয় মোটামুটিভাবে নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের মতোই (বছরে প্রায় ৮০০ টাকা)। অবশ্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ কিছু ব্যয় হয় প্রাইভেট পড়ার জন্য, সেজন্য ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি কমে যায়, শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যয়ের প্রায় সবটাই বরাদ্দ হয় শিক্ষকের বেতন ও স্কুলের সাজসজ্জার জন্য, সেখানে ব্র্যাক তার বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ বরাদ্দ করে ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনের জন্য। ব্যয়ের মাত্র ২৯ শতাংশ যায় শিক্ষকের বেতনে, আর মাত্র ৬ শতাংশ স্কুল ঘরের জন্য। ব্র্যাক দাবী করে যে, তাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা তিন বছরে সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের চেয়ে মৌলিক সাক্ষরতা বেশি অর্জন করে এবং তাদের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তির হারও বেশি। কাজেই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের বিচারে নিয়মিত স্কুলের চেয়ে ব্র্যাক স্কুলে মাথাপিছু ব্যয়ের হার কম হয়।

গণসাহায্য সংস্থা: স্বনির্ভর পড়ুয়া আর লিখিয়ে

গণসাহায্য সংস্থা ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ খুলনার দারিদ্র্যক্লিষ্ট ১৪টি গ্রামে কাজ শুরু করেছিল। এর প্রধান লক্ষ্য গ্রামীণ ও শহরবাসী দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন। ক্রমে ক্রমে এর

কাজ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩২টিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ হয় ১৯৮৭ সালে; ১৯৯৬ সালে বিভিন্ন জেলার গ্রামে ও শহরে স্কুলের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বিভিন্নমুখী শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষা।

গণসাহায্য সংস্থার কাজের একটি প্রধান এলাকা হল শহরের বস্তি এলাকা। দেশে শহরাঞ্চলগুলোতে বস্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা মহানগরীর প্রায় ৮০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে প্রায় চল্লিশ শতাংশই বস্তিতে বাস করে; আর এসব বস্তিবাসী অধিকাংশ শিশুর কাছাকাছি প্রাথমিক স্কুল নেই। যে সব স্কুল আছে তারও শিক্ষাসূচি বস্তির ছেলেমেয়েদের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য গণসাহায্য সংস্থা প্রথমে ঢাকা ও খুলনায় বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য ক'টি স্কুল খোলে। তাতে মূলত আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এদেশের বস্তি এলাকার পরিবেশের জন্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়। পাঁচ-বছর মেয়াদী এসব স্কুলের লক্ষ্য হচ্ছে:

* প্রথম শ্রেণী থেকেই ছেলেমেয়েরা স্বাধীন পড়ুয়া হবে
* শিশুদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে এবং তারা সৃজনশীল লিখিয়ে হবে
* শিশুরা হিসেব করা শিখবে
* বই ও অন্য ছাপা লেখা পড়তে আগ্রহী হবে
* নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর মান অর্জন করবে।

এছাড়া গণসাহায্য সংস্থা আরো ক'টি লক্ষ্য স্থির করে; তার মধ্যে রয়েছে: অনুপস্থিতির হার হবে ৫ শতাংশের কম; প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার হবে ৫ শতাংশের কম; অন্তত ৫০ শতাংশ ছেলেমেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে যাবে; তৃতীয় শ্রেণীর শেষে এক শ' ভাগ ছেলেমেয়ে গণিতের চারটি নিয়ম ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে করতে পারবে এবং তৃতীয় শ্রেণীর শেষে এক শ' ভাগ ছেলেমেয়ে সৃজনশীল রচনা লিখতে পারবে।

- **শিক্ষার্থী**: গণসাহায্য সংস্থার স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুব গরিব পরিবার থেকে আসে। তাদের বয়স ৪-১৪ বছরের মধ্যে আর পারিবারিক পটভূমিও ভিন্ন ভিন্ন; বেশির ভাগ প্রান্তিক চাষী, বর্গা চাষী, কারখানার শ্রমিক বা এমনি আর কিছু। অনেক সময় তাদের মা আর বোন ঝিয়ের কাজ করে, বাবা রিকশা চালায় বা দিনমজুরের কাজ করে। তাতে সংসারের যে আয় হয় তা দিয়ে খাবার বা আশ্রয় জোটানো শক্ত হয়।
- **স্কুলের জমি সংগ্রহ** : স্থানীয় লোকেরা স্কুলের জন্য জমি দেয় এবং গণসাহায্য সংস্থা আধা-পাকা স্কুল ঘর তৈরির খরচ বহন করে। সংস্থা যদি সে এলাকা ছেড়ে যায় তাহলে স্কুলঘর স্থানীয় লোকদেরই থেকে যাবে।

- **শিক্ষক**: স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নেওয়া হয়। গ্রামের প্রার্থীদের অন্তত বার বছরের শিক্ষা থাকতে হয়; শহরের শিক্ষকরা সাধারণত ডিগ্রিধারী। প্রধান শিক্ষকের নিম্নতম যোগ্যতা দু'বছরের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসহ শিক্ষায় ডিগ্রি। স্থানীয় মেয়ে প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রাথমিক নিয়োগ এক বছরের; কাজে দক্ষতা দেখালে এক বছর করে বাড়ানো হয়। প্রয়োজনে অস্থায়ী শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়।

- **শিক্ষক প্রশিক্ষণ**: নিয়োগের পর শিক্ষকদের তিন-দিনের একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং তারপর বার-দিনের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ হয়। প্রতি মাসের শেষে একদিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এবং বছরের শেষে পাঁচ দিনের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এসব প্রশিক্ষণে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি কিভাবে বস্তির পরিবেশে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা হয়। প্রতি স্কুলে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন পরিদর্শক এসে শিক্ষকদের কাজে সহায়তা দেন।

- **শিক্ষাসূচি ও শিক্ষার মেয়াদ**: গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার মেয়াদ তিন বছর (এটাকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হচ্ছে)। শহরের বস্তির জন্য মেয়াদ পাঁচ বছর। গ্রামের স্কুলগুলোতে শিক্ষক তিনজন এবং দু'শিফ্‌টে ক্লাস হয়। শিক্ষাক্রম নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলের মতোই এবং এমনভাবে তৈরি যেন তা শিশুদের জন্য অর্থপূর্ণ, সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। মূল পাঠ্যবইগুলো ছাড়াও শিক্ষার্থীরা একাধিক অন্য বই পড়ার সুযোগ পায়।

- **শিক্ষাদান পদ্ধতি**: সাধারণ বিদ্যালয়ে একই শ্রেণীতে বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় পড়ান। কিন্তু গণসাহায্য সংস্থার স্কুলে শ্রেণীর সব বিষয়ের দায়িত্বে থাকেন একজন শিক্ষক। তাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া শ্রেণীতে দলভিত্তিক শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যার ফলে শিক্ষকের পক্ষে সব শিশুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় এবং শিশুরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও গতি অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে: প্রচলিত পদ্ধতি মুখস্থবিদ্যা নির্ভর, এদের পদ্ধতি শিশু-নির্ভর; প্রচলিত পদ্ধতি শ্রুতিভিত্তিক নিষ্ক্রিয়, এদের পদ্ধতি সক্রিয়, দলগত কর্মভিত্তিক; প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা উপকরণের অভাব, এদের পদ্ধতিতে প্রচুর আকর্ষণীয় উপকরণের ব্যবহার। এই শিক্ষা দানে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়।

  গল্প বলা: শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয় গল্প বলার মধ্য দিয়ে। এসময় শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে বসিয়ে গল্প পড়ে শোনান। মূল উদ্দেশ্য শিশুদের মনোযোগ

আকর্ষণ করা, আনন্দ দেওয়া, শ্রবণ শক্তি আর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ানো এবং সর্বোপরি ভাষা বুঝতে সহায়তা করা।

পড়া : শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষের পড়ার টেবিলে বইয়ের প্রতিটি শব্দের ওপর আঙুল দিয়ে এক একজন করে শিক্ষার্থীকে বই পড়ানো। এভাবে পড়ানোর ফলে শিক্ষার্থীরা শব্দ চেনে, বানান শেখে এবং ধীরে ধীরে তাদের পড়ার দক্ষতা বাড়ে।

গণিত : চারজন করে শিক্ষার্থী নিয়ে তৈরি ছোট দলে বাস্তব উপকরণের সাহায্যে গণিতের ধারণা দেওয়া হয়। ছোট দলের শিক্ষার্থীরা আঁটি-কাঠির সাহায্যে সংখ্যা গণা, একক-দশক ও যোগ-বিয়োগের ধারণা পায়। বীচি, পাথর ইত্যাদির সাহায্যে তারা দ্রুত ভাগ আর গুণের ধারণাও পায়। এসব ধারণা তারা সহজেই বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে।

সৃজনশীল লেখা: সৃজনশীল টেবিলে বসে শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছামতো ছবি আঁকে। ছবি সম্বন্ধে তারা শিক্ষকের কাছে বর্ণনা দেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের দেয়া বর্ণনা ছবির নিচে লিখে দেন। শিক্ষার্থীরা এই লেখা অনুকরণ করে। এতে শিক্ষার্থীর লেখার দক্ষতা বাড়ে, বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে ও সৃজনশীলতা বাড়ে। এভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে স্বাধীনভাবে লিখতে শেখে।

সমাজবিজ্ঞান: শিক্ষক-শিক্ষিকা বাস্তব উপকরণের সাহায্যে সমাজবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের ধারণা দেন। শিশুরা সেই বিষয়ের ওপর ছবি আঁকে ও লেখে। এভাবে শিক্ষার্থীরা সমাজ ও তার নানা উপাদান সম্বন্ধে সঠিক, কার্যকর ও বাস্তব ধারণা পায়।

বিজ্ঞান: শিক্ষক-শিক্ষিকা বাস্তব উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা দেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরা উপকরণ ব্যবহার করে, ছবি আঁকে ও লেখে। এভাবে তারা বাস্তবভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষা পায় ও তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখে।

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে পাঠদান পদ্ধতি সাধারণভাবে শিক্ষককেন্দ্রিক সেখানে গণসাহায্য সংস্থার শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতি নিঃসন্দেহে উদ্ভাবনমূলক। পাঁচ বছরের শিক্ষাসূচিতে নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছাড়াও শিশুদের আরো নানা ধরনের বই পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা আট মাসের মধ্যে নিজে নিজে পড়তে পারে এবং আর ৮-১২ মাসের মধ্যে স্বাধীন লেখক হয়ে দাঁড়ায়। এসব বই খেটে খাওয়া ছেলেমেয়েদের পরিবেশ মনে রেখে লেখা। পড়া, লেখা, হিসেব করা এসব ছাড়াও সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই নানা ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজে অংশ নেয়; তার মধ্যে রয়েছে ছড়া বলা, গল্প বলা, সংগীত, নৃত্য, কাগজের ফুল তৈরি, খেলা, বাগান করা ইত্যাদি।

শ্রেণী ব্যবস্থাপনা: প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস হয় সকাল আটটা থেকে সাড়ে দশটা। এই সময়কে আবার তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়: যথাক্রমে ৩৫ মিনিট, ২৫ মিনিট ও ৪০ মিনিট। ক্লাসের এক কোণায় থাকে একটি ব্ল্যাকবোর্ড; এক পাশে বইয়ের তাকে থাকে বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি। শহরের স্কুলগুলো তিন শিফ্‌টে বসে: প্রথম আর তৃতীয় শিফ্‌টে বসে শিশুশ্রেণী, প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণী; দ্বিতীয় শিফ্‌টে সব শ্রেণী একসঙ্গে।

প্রতিটি শ্রেণীতে থাকে ত্রিশটি শিশু। শ্রেণীকক্ষে আছে তিনটি টেবিল; একটি বাংলার, একটি সৃজনশীল লেখার, আরেকটি অঙ্কের। ঘরের তিন কোণায় শিশুরা কাজ করতে পারে আর মাঝখানে নানা উপকরণ নিয়ে খেলার জন্য থাকে একটি মাদুর। ক্লাসের শুরুতে শিশুরা এসে ঐ মাদুরের ওপর বসে; শিক্ষক গল্প পড়েন একটি টুলের ওপর বসে যেন সব শিশু তাঁকে দেখতে পায়।

তারপর শিশুরা ভাগ হয়ে যায়: আটজন সৃজনশীল টেবিলে, ছ'জন বাংলার টেবিলে, ছ'জন অঙ্ক টেবিলে কাজ করে; বাকিরা ভাগ হয়ে কেউ মাঝখানে মাদুরে বসে বই পড়ে, কেউ গাণিতিক উপকরণ দিয়ে, কেউ শিক্ষা উপকরণ দিয়ে, কেউ বা জীবজন্তু/ব্লক দিয়ে খেলে; কেউ বাইরে গিয়ে খেলে হাড়ি-পাতিল বা দোকান দিয়ে। প্রতিদিন প্রত্যেক শিশু পালাক্রমে সব ধরনের কাজ করে। শিক্ষক এক এক দলে খানিকক্ষণ সময় কাটান এবং প্রত্যেক শিশুর কাজের দিকে দৃষ্টি রাখেন। এভাবে প্রত্যেক শিশু শিক্ষকের সহায়তা পায় এবং বাকি সময় নিজে নিজে কাজের মধ্য দিয়ে শেখে: যেমন নিজে অঙ্ক করা বা গল্পের বই পড়া বা কোন শিক্ষামূলক খেলা করা।

দেয়ালে টাঙ্গানো থাকে দেয়ালচার্ট; সাধারণত এগুলো পশু-পাখি, ফুল-ফল, তরি-তরকারি, মাসের নাম, দিনের নাম, ঋতুর নাম, জেলার বা দেশের মানচিত্র এসব নিয়ে তৈরি। প্রতি মাসে দেয়ালচার্ট বদলানো হয়। কিছু দরকারি শব্দও বড় বড় হরফে রঙিন কালিতে লিখে শিশুদের চোখের উচ্চতা বরাবর টাঙানো হয়। দেয়ালে শিশুদের আঁকা ছবিও টাঙানো হয়। প্রতি সপ্তাহে শিশুরা দেয়ালে টাঙাবার জন্য ছবি আঁকে।

সাধারণত তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাস সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত তিন ঘন্টা চলে। চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্রতি সপ্তাহে একটি করে প্রজেক্ট করে। প্রজেক্টের মাধ্যমে শিশুরা কোন নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে আর বিশ্লেষণ করতে শেখে। ক্লাসে যে সব প্রজেক্ট করা হয় তাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. ক্লাস বই: শিশুরা প্রতি সপ্তাহে কোন বিশেষ বিষয় নিয়ে একটি ক্লাস বই তৈরি করে। এতে থাকে সেই বিষয় নিয়ে শিশুদের আঁকা ছবি এবং তার নিচে ছবি সম্পর্কে বর্ণনা। এই বইটি ক্লাসেই থাকে।

২. নিজ বই : ক্লাস বই ছাড়াও শিশুরা প্রত্যেকে একটা করে নিজ বই তৈরি করে। এর জন্য তারা নিজেরা ছবি আঁকে। যে নিজে লিখতে পারে সে ছবির পরিচিতি নিজে লেখে, অন্যদের শিক্ষক সাহায্য করেন।

৩. দেয়ালচিত্র: শিশুরা দেয়ালচিত্রের জন্য নিজেরাই ছবি আঁকে। এর জন্য প্রতি মাসে ত্রিশ জন ছেলেমেয়ে ত্রিশটি ছবি আঁকে; ছবির নিচে পরিচিতি লেখা হয়। প্রতি সপ্তাহের দেয়ালচিত্র বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে দেয়ালে টাঙানো হয়।

ছেলেমেয়েরা প্রথম দু'বছরে ১২ থেকে ২৪খানা বই পড়ে। সাধারণত বাংলার জন্য তারা প্রথম বছরে পড়ে ৮ খানা, দ্বিতীয় আর তৃতীয় বছরে ১৪খানা করে। তাছাড়া শিক্ষক নানা উপকরণ ব্যবহার করেন। সৃজনশীল চিন্তা ও লেখার ওপর জোর দেওয়া হয়। নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা মাত্র একটি বাংলা বই পড়ে। সৃজনশীল পড়া ও লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য গণসাহায্য সংস্থা 'আনন্দ গান' নামে একটি শিশুপত্রিকা প্রকাশ করে।

সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে মুখস্থ করার ওপর বেশি জোর থাকে, তাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় তেমন আগ্রহ বোধ করে না। গণসাহায্য সংস্থার স্কুলের বৈশিষ্ট্য হল শিশুরা আনন্দ আর কাজের মধ্য দিয়ে দলগতভাবে শেখে; শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেক শিশুর শেখার দিকে ব্যক্তিগত নজর রাখেন। শিশুরা শব্দভাণ্ডার বাড়াবার জন্য অভিধান ব্যবহার করতে শেখে; আর প্রতি সপ্তাহে প্রজেক্ট করার মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তির উন্মেষ হয়।

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে অভিভাবক-শিক্ষক সম্পর্ক। অভিভাবকরা স্কুলের জন্য জমি দেন, বাড়ি বাড়ি জরিপ চালাতে সাহায্য করেন, স্কুলের পরিচালনাতেও অংশ নেন। এজন্য প্রতি মাসে শিক্ষক-অভিভাক সভা হয়; তাতে আগের মাসে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, যেমন শিক্ষার্থীদের বা শিক্ষকের অনুপস্থিতি, সে সব নিয়ে আলোচনা হয়। অভিভাবকদের শিশু ভর্তির সময় এক টাকা এবং প্রতি মাসে এক টাকা করে নামমাত্র ফি দিতে হয়; এই টাকা কিভাবে ব্যয় করা হবে তা শিক্ষক ও অভিভাবকরা মিলে একযোগে স্থির করেন।

গণসাহায্য সংস্থার স্কুলে শিক্ষার্থীদের মাথা পিছু ব্যয় ব্র্যাকের স্কুলের মতোই অর্থাৎ বছরে প্রায় ৮০০ টাকা।

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র: প্রযুক্তিনির্ভর মৌলিক শিক্ষা

বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে। এর মূল লক্ষ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসা। এই লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ

হল প্রযুক্তিনির্ভর মৌলিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যাতে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং তার সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা হবে। এসব স্কুল বসে একটি বাঁশ বা মাটির তৈরি ঘরে যা সচরাচর এলাকার জনসাধারণ তাঁদের বাড়ির আঙিনাতেই ব্যবহার করতে দেন।

একটি ইউনিয়নের মতো এলাকায় বিশটি মৌলিক বিদ্যালয়ের তদারকির জন্য থাকে একটি গ্রামীণ মৌলিক বিদ্যালয় ও প্রযুক্তিকেন্দ্র। এসব বিদ্যালয়ে থাকে চারটি স্তর: অঙ্কুর, বিকাশ, অগ্রসর-১ ও অগ্রসর-২। এগুলো মোটামুটি নিয়মিত বিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সমকক্ষ এবং এক বছর মেয়াদী। এদের মধ্যে প্রথম দু'টি স্তর মৌলিক বিদ্যালয়ে থাকে আর শেষের দু'টি স্তর থাকে কেবল গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রে। বিকাশ স্তরটি অবশ্য দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া যায়। অঙ্কুর ও বিকাশ স্তরে প্রধানত অক্ষর জ্ঞান, হিসাব জ্ঞান ও কিছু ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়; অগ্রসর-১ ও অগ্রসর-২ স্তরে মৌলিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটি বা দু'টি উৎপাদনমুখী প্রযুক্তিদক্ষতা অর্জনেরও সুযোগ থাকে।

- **শিক্ষার্থী:** এই কর্মসূচিতে এমন সব ছেলেমেয়ের ভর্তি করা হয় যারা আগে কখনো স্কুলে ভর্তি হয় নি বা হলেও ঝরে পড়েছে। ভর্তির জন্য কোন বয়স-সীমা নেই। কাজেই যাদের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে তারাও এখানে ভর্তি হতে পারে। ছেলেমেয়েরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অঙ্কুর বা বিকাশ স্তরে ভর্তি হতে পারে। প্রতিটি স্তরে ২০ থেকে ৩০ জন ভর্তি হয়; তার অন্তত ৫০ শতাংশ থাকে মেয়ে।

- **শিক্ষক:** প্রতিটি মৌলিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকেন একজন। সচরাচর শিক্ষক স্থানীয় কোন ছেলে বা মেয়ে যে মাধ্যমিক স্কুল শেষ করেছে বা শেষ করার উপক্রম করেছে। কখনো কখনো যে সব ছেলেমেয়ে গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্র থেকে বেরিয়েছে তাদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে মৌলিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রে থাকেন দু'জন শিক্ষক আর পাঁচজন সহকারী শিক্ষক। শিক্ষকরা কারিগরি শিক্ষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং সহকারী শিক্ষকরা মোটামুটি লেখাপড়া জানা দক্ষ কারিগর যাঁরা সেই এলাকাতেই কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে ১৮টি গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রের আওতায় আছে ৪০০ মৌলিক বিদ্যালয় আর তাতে ২৩,০০০ শিক্ষার্থী। খুব তাড়াতাড়ি কাজ পেতে সুবিধে হবে এমন সব পেশার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়—যেমন পোশাক তৈরি, টাই-ডাই, বাটিক, মুরগি পালন, রেশম চাষ, সাবান তৈরি, মোমবাতি তৈরি ও মাটির বাসন-কোসন তৈরি। গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রে আরো কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ

দেওয়া হয় যেগুলো আগে শুধু ছেলেদের কাজ বলে গণ্য হত, যেমন কাঠমিস্ত্রীর কাজ, ধাতুর কাজ, ওয়েল্ডিং, যন্ত্রপাতি মেরামত ইত্যাদি। তৈরি করা জিনিসগুলো স্থানীয়ভাবে ও দূরবর্তী বাজারে সুবিধেমতো বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ও তাদের সাহায্যকারী কারিকরদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি দু'মাস পর পর বিক্রীর লাভ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

- **কিশোরী কর্মসূচি:** মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও কিশোরীদের জন্য বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের একটি বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা ও তাদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। এই কর্মসূচিতে প্রতিটি মৌলিক বিদ্যালয়ে ৫-১০ জন মেয়ে নেওয়া হয় আর প্রতিটি গ্রামীণ প্রযুক্তিকেন্দ্রে নেওয়া হয় ২৫-৩০ জন। এসব মেয়েদের পাঁচ জন করে দলে ভাগ করা হয়। যেহেতু তাদের সবারই বাড়ি কাছাকাছি কাজেই তাদের সবার মধ্যে এমনিতেই বেশ ঘনিষ্ঠতা থাকে। এসব মেয়েকে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহায়তায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মে ঋণ দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির একটা লক্ষ্য হল মেয়েদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে তোলা যাতে তারা স্থানীয়ভাবে নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে গ্রামে স্যানিটারি পায়খানা স্থাপন, শিশুদের ছ'টি মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা, গ্রামের লোকদের কম্পোস্ট সার তৈরিতে উৎসাহ দেওয়া, মায়েদের পুষ্টি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি। গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থীরা এসব কাজ করে।

১. **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জরিপ:** সাধারণত মেয়েরা শরীরের ওজন এবং অন্যান্য মাপ নেয়। তারপর সাধারণ কিছু রোগ প্রতিরোধের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। কখনো কখনো বেশি অসুস্থদের কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে ওষুধ নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়, যেমন রাইবোফ্ল্যাবিন (ভিটামিন বি-২) বড়ি, আয়রন বড়ি বা ওরস্যালাইন।

২. **উন্নত চুলা বসানো:** গ্রামের মেয়েরা যে সাধারণ মাটির চুলা ব্যবহার করে তার জ্বালানি-দক্ষতা খুব কম আর তা তেমন নিরাপদও নয়। এতে বেশ ধোঁয়া হয় আর রান্নাঘর বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যায়। তাছাড়া জ্বালানি কাঠের ৪০-৫০ শতাংশ অপচয় হয়। এদেশের বিজ্ঞানীরা বিকল্প উন্নত মানের চুলা উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষার্থীরা এধরনের চুলা ব্যবহার করার জন্য গ্রামের মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে এবং উন্নত চুলা তৈরি করে দেয়।

৩. **পরিবেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা:** গ্রামে সাধারণত রান্নাঘর, গরুর গোয়াল ও মুরগির খোপের নানা আবর্জনা বাড়ির পাশেই ফেলে রাখা হয়। এতে পরিবেশের মারাত্মক দূষণ ঘটে। শিক্ষার্থীরা গ্রামের মেয়েদের বাড়ির কাছে গর্ত খুঁড়ে তাতে এসব আবর্জনা ফেলতে উৎসাহিত করে। এর ফলে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকে, তাছাড়া এই গর্তে তৈরি কম্পোস্ট বাড়ির আঙিনায় তরি-তরকারির খেতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এধরনের কারিগরি দক্ষতা অর্জনের ফলে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হয়ে উঠছে। অনেক মেয়ে এরপর নিয়মিত স্কুলে ভর্তি হয়ে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। এসব কিশোরীর জীবনে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসছে তারও মূল্য কম নয়। গ্রামের অনেক রক্ষণশীল পরিবারেই গান-বাজনা, নাচ, কবিতা বা নভেল পড়া সুনজরে দেখা হয় না। অথচ এসব কিশোরী এধরনের বই-পত্র পড়ায়, খেলাধুলা, নাচ-গানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে যা আগে শুধু মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মান বাড়ানো

এসব দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রাথমিক শিক্ষায় নানা উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচি প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব কর্মসূচির একটা সীমাবদ্ধতা হল অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি আর মাঠ পর্যায়ের কর্মীর মাঝখানে আর খুব যোগ্য শিক্ষাকর্মী নেই। তার ফলে সব কিছু তদারক করতে গিয়ে প্রধান কর্মকর্তাদের ওপর বেশ চাপ পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তারও সময়কাল খুব কম। তাতে শিক্ষক হয়তো নিয়োগের পর পরই নতুন পদ্ধতি ভালমতো রপ্ত করে উঠতে পারেন না। আরেক সমস্যা হল যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা উপকরণের অভাব। যদিও সরকারি স্কুলের তুলনায় এসব স্কুলের ব্যবহৃত উপকরণ অনেক বেশি তবু এরা শিক্ষার যে ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে তাতে আরো উপকরণ প্রয়োজন হয়। এজন্য ব্র্যাক, গণসাহায্য সংস্থা এসব সংস্থা স্বল্পব্যয় উদ্ভাবনমূলক উপকরণ ব্যবহারের ওপর জোর দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকাল বাড়াবার উদ্যোগ নিয়েছে।

এসব উদ্ভাবনের সত্যিকার সার্থকতা অবশ্য নির্ভর করবে কত দ্রুত এবং কি পরিমাণে এসব উদ্ভাবন দেশের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় কাজে লাগানো হচ্ছে এবং সে শিক্ষার মান বাড়াতে সাহায্য করছে। সাম্প্রতিককালে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উদ্যোগে দেশে ব্যাপক আকারে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও প্রাথমিক স্তরে যত শিক্ষার্থী আছে তার প্রায় নব্বই শতাংশ আজ নিয়মিত প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখছে। কিন্তু সে শিক্ষার নিম্ন মানের কারণে তা থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে এবং তাতে দেশের সম্পদের বিরাট অপচয় ঘটে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দেশের সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব নেবে; তখন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থাগুলো নব্যসাক্ষরদের জন্য অনুসারক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি বিস্তৃত করবে। এ অবস্থায় নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করে এগুলোর কর্মদক্ষতা বাড়ানো এবং অপচয় কমানো আজ তাই অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে এসব উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা কর্মসূচি বিরাট অবদান রাখতে পারে।

জীবনভর শেখার সমাজ

. . . উন্নয়ন হল মানুষের জন্য, মানুষকে দিয়ে, মানুষের বিষয়ে। শিক্ষার ব্যাপারেও সেই একই কথা। তার লক্ষ্য অজ্ঞানতা আর পরনির্ভরতার বেড়াজাল আর সীমাবদ্ধতা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। শিক্ষা মানুষের বস্তুগত আর মনোগত স্বাধীনতা বাড়িয়ে দেয়—তার নিজের ওপর, জীবনপদ্ধতির ওপর, আর তার চারপাশের পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ায়। —জুলিয়াস নাইরেরি (১৯৭৬)

আজকের পৃথিবীতে কাজে যতটা না হোক, অন্তত কথায় কতকগুলো ধারণা যেন অনেকটা সর্বস্বীকৃত নীতির মর্যাদা পেয়েছে; তার মধ্যে পড়ে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সমানাধিকার, সবার জন্য রুটি-রুজি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অধিকার—এমনি সব ধারণাগুলো। মাত্র কয়েক শ' বছর আগেও অবস্থা অনেকটা ভিন্নরকম ছিল। তখন ধরে নেওয়া হত সমাজের সব ক্ষমতার অধিকারী হল রাজা, জমিদার আর পুরোহিত-মোল্লা শ্রেণী—যারা ঐশী বিধানের বলে তাদের সে অধিকার পেয়েছে। সাধারণ প্রজাদের কাজ হল কেবল হুকুম তামিল করা, খেটে যাওয়া আর ফসল ফলানো। তাই সব ধরনের শিক্ষা আর জ্ঞান থেকে যে শক্তি তারও অধিকার ছিল কেবল অভিজাত সমাজের লোকদের। তাই পনের শতকে ছাপাখানার উদ্ভবের পর বইপত্রের মাধ্যমে জ্ঞানের বিস্তার যখন বেশ সহজ হয়ে গেল তখনও বহুযুগ ধরে সে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারত কেবল সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা। ধরেই নেওয়া হত যে, চাষাভুষোদের জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া যায় না; কি জানি তাতে যদি তাদের চোখ ফুটে গিয়ে মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে ওঠে! চাষাভুষোদের যদি বা কিছু পড়বার সুযোগ দেওয়া হত তাও হত খুব সাবধানে ভালমতো যাচাই করে।

যুগ যুগের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ যে গণতন্ত্রের অধিকার লাভ করেছে তাতে এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য সে পরিবর্তন সব দেশে সমান

তালে ঘটে নি। আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া দেশে গণতন্ত্রের লড়াইতে এখনও মানুষকে রক্ত-ভেজা পথ পেরিয়ে যেতে হয়; সব মানুষের শিক্ষার অধিকারও আজো পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। তবে জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই যেমন কথা বলছে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে তেমনি সারা পৃথিবীতে সব মানুষের শিক্ষার অধিকার, পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকার নিয়েও হয়ে উঠছে উচ্চকণ্ঠ। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব-উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯১ শুরু হয়েছে এই মূলনীতির ঘোষণা দিয়ে: "নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে মানুষকে রাখতে হবে সব উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে; মানুষকে ঘিরে বুনতে হবে সব উন্নয়ন, উন্নয়নকে ঘিরে মানুষ নয়।" আর এই মূলনীতির স্বীকৃতি থেকেই সারা পৃথিবীতে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে আজ যেমন আলোড়ন চলছে ইতিহাসে এর আগে আর কখনো এমন হয় নি।

মানুষের সব রকম প্রতিভা আর ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষার যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আজ আর কোন বিতর্ক নেই। আর তাই সব মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অধিকারও আজ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ শতক জুড়ে অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রবার্ট সলো, আর্থার শুল্‌জ্‌ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটে তা শুধু ব্যক্তিমানুষের বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর একারণেই জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯০ সালে বিশ্বসম্মেলন ডেকে তাতে ২০০০ সালের মধ্যে দুনিয়ার সব মানুষের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করার ডাক দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য বা নীতি স্থির করা আর তার বাস্তবায়ন করা সব সময় এক জিনিস নয়— আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ যারা রাষ্ট্রীয় নেতাদের হরহামেশা নানা রকম আশ্বাসের বাণী শুনিয়ে তারপর সুবিধেমতো সে সব নীতি পাল্টাতে দেখি তারা এ কথা বেশ ভাল করেই জানি। তবু আবার এটাও তো সত্যি যে, সবার জন্য শিক্ষা মানুষের এক বহু পুরনো স্বপ্ন হলেও আজ পৃথিবীতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আর উৎপাদন-ব্যবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে ইতিহাসে এই প্রথম এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী অবশেষে পৃথিবীতে নিরক্ষর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা কমবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিশ শতক জুড়ে সাক্ষরতার হার বাড়তে থাকলেও, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারায় মোট নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালে যেখানে ১৫ বছরের বেশি বয়সী নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ছিল ৯৪.৮ কোটি, সেখানে হিসেবে বলা

হচ্ছে ২০০০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা কমে দাঁড়াবে ৯৩.৫ কোটি (সারণি ১০); আশা করা যাচ্ছে তারপর এই সংখ্যা আরো কমতেই থাকবে। একুশ শতকে আমরা হয়তো পাব একটি সত্যিকার সাক্ষর পৃথিবী। আর তখন বাংলাদেশেও এ স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠবে।

সারণি ১০ : পৃথিবীতে নিরক্ষর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে

সন	১৯৫০	১৯৬০	১৯৭০	১৯৮০	১৯৯০	২০০০ (প্রাক্কলিত)
নিরক্ষরের সংখ্যা (কোটির অঙ্কে)	৭০.০	৭২.০	৭৫.৮	৮২.৪	৯৪.৮	৯৩.৫

তথ্য সূত্র : ইউনেস্কো।

দুনিয়া জুড়ে শিক্ষার জন্য যে নতুন তোড়জোড় শুরু হয়েছে তাতে অবশ্য শিক্ষার কাঠামো সম্বন্ধে কিছু নতুন চিন্তা-ভাবনারও সূত্রপাত ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে শিক্ষার যে সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তা সব মানুষের শিক্ষার চাহিদা মেটাবার সঙ্গে যেন তাল রেখে উঠতে পারছে না। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কাঠামোগুলো গড়ে উঠেছে শিক্ষা যে সময়ে সমাজের ওপরতলার অল্প কিছু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল মোটামুটি সেই সময়ের চাহিদার কথা মনে রেখে। কিন্তু আজ শিক্ষার আয়োজন করতে হচ্ছে দেশের সব মানুষের জন্য—তাই দরকার হয়ে পড়ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক আর আধা-আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে তোলা যায় নি তাদের জন্য শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের চাহিদা মেটানো হয়ে উঠছে খুবই কঠিন।

অবশ্য মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়াটাই যে সমস্যার একমাত্র কারণ তা নয়। মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি মানুষের জ্ঞানের পরিমাণও বেড়ে উঠছে বিপুলভাবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার ফলে প্রতি আট-দশ বছরে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার আজ দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আবার এই জ্ঞানের ভাণ্ডার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে যোগ হয়েছে সমাজের রূপান্তরের ধারা। আগের দিনে সমাজে রূপান্তর ঘটত খুব ধীর গতিতে; আজ দেশে দেশে মানুষের সমাজ বদলে যাচ্ছে যেন বিদ্যুতের বেগে! এই বিপুল রূপান্তরের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ক্রমাগত মানুষকে জানতে হচ্ছে নতুন জ্ঞান, নতুন প্রযুক্তি, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন ব্যবস্থাপনা; আয়ত্ত করতে হচ্ছে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা। আর পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ এমন বেড়ে উঠেছে যে, কোন দেশ এসব

পরিবর্তনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে তারও কোন উপায় নেই। বিচ্ছিন্ন থাকবার একমাত্র অর্থ হবে প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া—হয়তো একবারেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

জ্ঞানের জগতে এত পরিবর্তন ঘটা, সমাজের এমন দ্রুত বদলে যাওয়া এসবের একটা ফল হচ্ছে, আজকের শিশু-কিশোরদের শিক্ষা দিয়ে শুধু একালের পৃথিবীর জন্য তৈরি করলেই চলছে না, তাদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হচ্ছে যেন তারা আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাবারও যোগ্য হয়ে ওঠে। এমনি পরিবর্তনশীল পৃথিবীর জন্য তৈরি হবার ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে যতটা হতে পারে তার চেয়ে আরো ভালভাবে হতে পারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। তবে এ ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে দেখলে চলবে না; দেখতে হবে পরিপূরক হিসেবে। এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে যেখানে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক আর উপানুষ্ঠানিক সব ধরনের শিক্ষা সহাবস্থান করবে আর তাদের সমন্বিত ফলাফল পড়বে সমগ্র সমাজের ওপরে।

সাক্ষরতা আর জীবনভর শিক্ষা

নতুন দিনের যে দাবী শিক্ষাব্যবস্থার ওপর তা কি পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ আর আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ওপর ঠিক একই ধরনের হবে?—তা হয়তো ঠিক হবে না। উন্নত দেশগুলো গত দু'শ' বছর ধরে বুনিয়াদি শিক্ষার একটা মোটামুটি পাকা রকম সর্বজনীন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, অথচ আমরা আজ কেবলই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি। তাই পাশ্চাত্যের দেশগুলো যেখানে বুনিয়াদি শিক্ষার পরে মানুষের বাড়তি পেশাগত দক্ষতা অর্জন বা কোন ধরনের শখ মেটাবার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়, সেখানে আমাদের দেশে একেবারে বুনিয়াদি সাক্ষরতা অর্জন বা প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তবু সাক্ষরতা অর্জন তো শুধু শিক্ষার জগতে ঢোকার একটা চাবিকাঠি মাত্র; আসল শিক্ষা শুরু হয় এই চাবিকাঠি পাবার পরে; আর সেটা আমাদের দেশে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হওয়া সম্ভব শুধু উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতেই।

সত্তরের দশকের শুরুতে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর মহাপরিচালক শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। তার সভাপতি হয়েছিলেন ফরাসি দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এদগার ফ'রে (Edgar Faure)। এই কমিশন ১৯৭২ সালে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি শেষ করেছিলেন; রিপোর্টটির নাম দেওয়া হয়েছিল: Learning to Be: The World of Education, Today and Tomorrow অর্থাৎ 'জীবনের জন্য শেখা:

শিক্ষার জগৎ, আজ ও আগামী দিনে'। এই কমিশন চারটে বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিলেন: প্রথমত আজকের দিনের আন্তর্জাতিক সমাজ, দ্বিতীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস, তৃতীয় এই ধারণা যে, সব উন্নয়নের লক্ষ্য হল মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দেওয়া, আর চতুর্থ হল পরিপূর্ণ মানুষ হবার জন্য চাই জীবনভর শিক্ষা। কমিশনের রিপোর্টে প্রতিফলিত হল এই জীবনভর শিক্ষা কিভাবে হতে পারে আর এমন সমাজ কি করে তৈরি করা যায় যেখানে সবাই এমনি জীবনভর শিক্ষা নেবে।

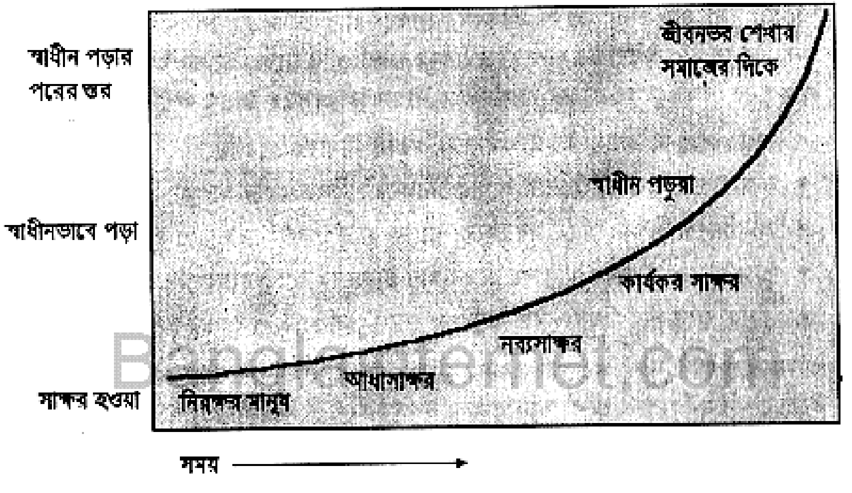
এই কমিশনের ধারণামতো আগামী দিনের জীবনভর শেখার সমাজ হবে এমন যেখানে প্রত্যেক মানুষ সারা জীবন নিজে যেমন শিখে চলে তেমনি অন্যদেরকেও শেখাতে থাকে। এই সমাজে স্কুল-কলেজ যেমন তেমনি সমাজের আরো নানা সংস্থা সব মানুষের জন্য শিক্ষার আয়োজনে অংশ নেয়। আজ যখন বিশ শতক পেরিয়ে আমরা দ্রুত একুশ শতকের দিকে এগিয়ে চলেছি তখন এই ধারণাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বলা হচ্ছে এর মধ্যে আমরা তথ্যযুগে প্রবেশ করেছি; একুশ শতক আসতে আসতে তথ্যযুগ পূর্ণ রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠবে। এর আগের অন্য সব যুগে বস্তু আর শ্রম ছিল সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান; তাই বস্তু আর শ্রমসম্পদের ওপর যারা আধিপত্য বিস্তার করতে পারত তারাই হত ক্ষমতাবান। তথ্যযুগ হল এমন এক যুগ যখন সম্পদ আর ক্ষমতার মূল উৎস হয়ে দাঁড়ায় তথ্য, জ্ঞান আর যোগাযোগ ব্যবস্থা। জ্ঞান যদি হয় ক্ষমতার প্রধান উৎস তাহলে সবাই ক্ষমতাবান হবার জন্য বেশি করে জ্ঞান অর্জন করতে চাইবে। কমিশনের তাই সুপারিশ হল সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সংস্কার করা দরকার যেন সমাজ ক্রমে ক্রমে নিরবচ্ছিন্ন শেখার স্তরে পৌঁছতে পারে।

গত দু'তিন দশকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটেছে। বিপুল পরিমাণ তথ্য চালাচালি করার শক্তি নিয়ে অসাধারণ শক্তিধর সব কম্পিউটার আমাদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। কল-কারখানার উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনোদন, সংবাদ-মাধ্যম, প্রকাশনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য—এমন কোন ক্ষেত্র আজ কল্পনা করা শক্ত যেখানে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া জাদুকাঠির মতো রূপান্তর না ঘটিয়েছে। আর এই অগ্রগতির ধারায় যেন ক্রমেই আরো বেগ সঞ্চারিত হচ্ছে। আজ শুধু একটি 'ইন্টারনেট' সংযোগের সাহায্যে দুনিয়ার এক দূর প্রান্তে বসে যে কোন মানুষ পৃথিবীর তাবৎ বিশাল পাঠাগার আর বিশাল তথ্যভাণ্ডারের সব তথ্য তার হাতের মুঠোয় পেতে পারে। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের মানুষের কাছে হয়তো এই সুযোগ এখনও খুব সহজলভ্য নয়; কিন্তু আর সব দেশের মানুষের কাছে যদি এ ধরনের সুযোগ পৌঁছে যায় তাহলে এদেশের মানুষের কাছে এমন সুযোগ বেশিদিন দুর্লভ থাকবার কথাও নয়।

এমন তথ্যযুগের সমাজে সনাতন ধরনের স্কুল-কলেজের প্রয়োজন যে ফুরিয়ে যাবে তা নয়; তবে এসব প্রতিষ্ঠান সমাজের সব মানুষের সারা জীবন ধরে শেখার চাহিদা মেটাতে পারবে না। এই নতুন ধরনের সমাজে চারপাশের অবস্থা যেমন দ্রুত বদলে যেতে থাকবে তেমনি সব মানুষকেই তার সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য সারা জীবন ধরে ক্রমাগত নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে হবে; আর সেজন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যারা নতুন লেখাপড়া শিখছে তাদের জন্য প্রাথমিক ধরনের বুনিয়াদি শিক্ষার পর পরই সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন থাকতে হবে। এসবের মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত মজবুত হবে তেমনি চাহিদা অনুযায়ী ক্রমাগত নতুন নতুন জিনিস শিখে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারা তাদের জীবনের মানকে আরো উন্নত করে তুলতে পারবে।

অবশ্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বেশির ভাগ মানুষ কেবল সাক্ষরতার সীমা পেরোতে চলেছে সেখানে শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহটা নানা ধরনের মাঝারি ধাপ পেরিয়ে এগোতে থাকবে: যেমন নিরক্ষর থেকে আধাসাক্ষর, নব্যসাক্ষর, কার্যকর সাক্ষর, স্বাধীন পড়ুয়া, তারপর অবশেষে নিরবচ্ছিন্নভাবে শেখার সমাজ। স্বভাবতই শেখার এসব নানা স্তর দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই সঙ্গে পাশাপাশি চালু থাকবে; বুনিয়াদি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব যেমন ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকবে, তেমনি অন্যদিকে অব্যাহত শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

চিত্র ৫ : উন্নয়নশীল দেশে জীবনভর শিক্ষার স্তরে পৌঁছতে হলে অনেকগুলো মাঝারি ধাপ পেরোতে হবে



ধারণাটা এদেশে নতুন নয়

বাংলাদেশ শিক্ষার দিক থেকে বেশ পিছিয়ে পড়া দেশ হতে পারে, কিন্তু তা বলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণা এদেশে যে একবারে নতুন তা নয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই ১৯৭২ সালে এই নতুন স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড: মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় তাঁদের রিপোর্টে "নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক [উপানুষ্ঠানিক] শিক্ষা" নামে একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন থাকা প্রয়োজন। এই কমিশন মত প্রকাশ করে যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার অপ্রতুলতা, তাতে সম্পদ ও স্থানের অভাব, জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষার ক্ষীণ সম্পর্ক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন বেড়ে যাবার কারণেই আজ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব এমন বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান ভূমিকা হবে প্রাথমিক ও বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু শুধু এতেই যে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে বলছেন, আজকের পৃথিবীতে প্রতি আট-দশ বছরে মানুষের জ্ঞানের পরিধি দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে শুধু চারপাশের প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলেও সবাইকে ক্রমাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়িয়ে চলতে হবে। আর তথ্যযুগ যেভাবে হুড়মুড়িয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তাতে ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব বেড়েই চলেছে; এই প্রক্রিয়ায় একটা প্রধান ভূমিকা থাকবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার।

এভাবে দেখলে বুনিয়াদি শিক্ষার বাইরে আর যত রকম শিক্ষা সব মানুষ চাইতে পারে তাকেই বলা যায় অব্যাহত বা জীবনভর শিক্ষা; আর জীবনভর শেখার সমাজ তৈরির জন্য এই শিক্ষার আয়োজন হয়ে পড়ে একান্ত জরুরি। আজকের উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ ধরনের শিক্ষা যেসব কারণে জরুরি হয়ে দাঁড়ায় তা এভাবে উল্লেখ করা যায়:

- চলতি ধরনের সব সাক্ষরতা কর্মসূচির অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কাঠামো,
- নব্যসাক্ষরদের চর্চার অভাবে আবার নিরক্ষরে পরিণত হবার আশঙ্কা,
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন থেকে ব্যাপক হারে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া,
- সাক্ষরতাকে ক্রমাগত মানুষের জীবন মান উন্নয়নের কাজে ব্যবহারের প্রয়োজন,
- দুনিয়া জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ও বিপুল বেগে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পর প্রধানত কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এন.জি.ও-র উদ্যোগে শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তবে

তাদের অনেকেরই শিশু, কিশোর-কিশোরী বা বয়স্ক পর্যায়ের বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও অব্যাহত শিক্ষা বা জীবনভর শিক্ষার ব্যবস্থা খুব কম সংস্থারই আছে।

ইতোমধ্যে গত ক'দশক ধরে ইউনেস্কো সারা পৃথিবীতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব উদ্যোগের একটা ভিত্তি এই যে, কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার একটা বেশ বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। আর অনেকটা একারণেই ইউনেস্কোর নেতৃত্বে জাতিসংঘের সব অঙ্গ সংগঠন আজ 'সবার জন্য শিক্ষা'র দুনিয়া জোড়া আন্দোলন শুরু করেছে। এই আন্দোলনের কৌশলগত দিকে দু'ধরনের পদ্ধতির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বেশ কিছুকাল ধরে চলছে। তার একটা হল শিক্ষা বিস্তারের জন্য মূলত প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর ওপর জোর দেওয়া; আরেকটা হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলনের ওপর জোর দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু কিছু দেশ সাক্ষরতা বিস্তারে বেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে বিশেষ করে ভিয়েতনাম, কিউবা, নিকারাগুয়া এসব দেশের নাম করা যায়। ১৯৪৫ সালে ভিয়েতনামে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৫ শতাংশ; ব্যাপক সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে দু'কোটি জনসংখ্যার সে দেশে ১৯৫৮ সালের মধ্যে ১২ থেকে ৫০ বছর বয়সী সব মানুষকে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব হয়। এমনি সাক্ষরতার আন্দোলন ১৯৬০ সালে কিউবায় শুরু হয়; এক বছরে সে দেশে সাত লাখ লোককে সাক্ষর করা হয়। নিকারাগুয়ায় ১৯৮৪ সালে এমনি আন্দোলনের ফলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৮৭ শতাংশে ওঠে। এধরনের সাক্ষরতা আন্দোলন চীন, তানজানিয়া, ব্রাজিল, ইরাক, ইথিওপিয়া, ভারত এসব দেশেও ফলপ্রসূ হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে, যথাযথ অবস্থায় শিক্ষার আন্দোলনের মাধ্যমেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির ফলে সাক্ষরতা বিস্তারে বিপুল অগ্রগতি ঘটতে পারে।

এসব আন্দোলনের একটা লক্ষ্যযোগ্য দিক হল সচরাচর সাক্ষরতার সঙ্গে জনগণের জীবন মান উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক দক্ষতা বিনির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয় যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'কার্যকর সাক্ষরতা'র ধারণা। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইউনেস্কো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের এক বড় রকম উদ্যোগ নেয়; তার নাম দেওয়া হয় Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL)। এতে এই অঞ্চলের জন্য পরস্পর-সংবদ্ধ এক ত্রিমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়; তাতে রয়েছে (ক) নিরক্ষরতা দূর করা; (খ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন; আর (গ) অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসব উদ্যোগেরই পরিণতি হিসেবে আসে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ সবার জন্য শিক্ষা নিয়ে বিশ্বসম্মেলন।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়সের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা আজ ছ'কোটি; ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ নিরক্ষর (মেয়েদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ, পুরুষদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ)। দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা তা অতিমাত্রায় দুর্বল। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের আদৌ ধরে রাখতে পারে না; যারা টিকে থাকে তাদেরও শিক্ষার মান হয় বেশ নিচু। ১৯৮৮ সালে দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোর প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৩.৮ লাখ; তার মধ্যে ১৯৯৩ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে মাত্র ১৭.৪ লাখ বা ৫১.৫ শতাংশ। স্পষ্টতই প্রাথমিক শিক্ষায় যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম এই স্তর শেষ করে। সরকার বলছেন ঝরে পড়ার হার ২০০০ সাল নাগাদ ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে অর্থাৎ এর চেয়ে নিচে যে নামানো যাবে এমন ভরসা কেউ দিতে পারছেন না। এমনি যে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার হাল সেখানে সবার জন্য শিক্ষার আয়োজন নিশ্চিত করতে হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর ভরসা করা ছাড়া কোন গতি নেই। সরকারও এটা অনেকটা মেনে নিয়েছেন ১৯৯৫ সালে দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প ভাবতে হবে, বরং কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন যে একে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে দেখার সুপারিশ করেছিল সেটা মেনে নেওয়াটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আসলে শিক্ষার আয়োজনকে দেখা দরকার একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে; তার মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হবে সমান মর্যাদার দু'টি উপ-ব্যবস্থা। এমন একটি ব্যবস্থায় দেশের সব নাগরিকের জন্য জীবনভর আগ্রহ, অভিরুচি বা নিজস্ব প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। সে শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক যে ধারারই হোক তাকে অবশ্যই হতে হবে যথাযথ মানসম্মত।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এন.জি.ও. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এসব সংস্থা প্রধানত কাজ শুরু করে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যায় এদেশের দুঃস্থ মানুষদের সবচেয়ে বেশি দরকার হল সচেতনতা ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ। সত্তরের দশকে এ নিয়ে বেশ কিছু সমীক্ষা চালাবার পর এসব সংস্থা তাদের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক ধাঁচের গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সত্তরের দশকে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে ব্র্যাক, আর.ডি.আর.এস., আশা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রভৃতি সংস্থা। আশির দশকে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়

গ্রামবান্ধব (এফ.আই.ভি.ডি.বি.), সপ্তগ্রাম, ডি.ই.আর.সি., ঢাকা আহছানিয়া মিশন এমনি আরো অনেক। কিছু কিছু সংস্থা কিশোর-কিশোরীদের জন্যও কার্যক্রম আরম্ভ করে। শিশুদের জন্য কিছু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সত্তরের দশকে শুরু হয়েছিল; আশির দশকে তা আরো ব্যাপক হয়। এক্ষেত্রে অনেক সংস্থার মধ্যে ব্র্যাক-এর কর্মসূচি সবচেয়ে বড় আকার নেয়; নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি ব্র্যাক-এর শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লাখের কাছাকাছি।

গত দু'যুগ ধরে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে : বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ আর তাতে ফলও পাওয়া যায় ভাল; সাক্ষরতার পরবর্তী অনুসারক এবং অব্যাহত শিক্ষার কর্মসূচি না থাকলে নব্যসাক্ষররা প্রায়শ আবার নিরক্ষরে পরিণত হয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থপূর্ণ হতে হলে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি হওয়া দরকার আর তাতে মেয়ে শিশু ও নারীদের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলনের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যেসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কাজে জড়িত তাদের সমন্বয়ক সংস্থা হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্ভব। প্রথম দিকে এর ভূমিকা ছিল মূলত এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় আর তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াবার উদ্যোগ; পরে দেখা গেল যেহেতু দেশে বেশিরভাগ বুনিয়াদি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশে শিক্ষার সার্বিক মান বাড়াবার চেষ্টা হবে দুঃসাধ্য। তাই সারা দেশে শিক্ষার শুধু পরিমাণগত বিস্তার নয়, গুণগত মান বাড়াবার কথাও সামগ্রিকভাবে ভাবতে হবে। আর একারণেই শিক্ষার জন্য একটি ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অনেকগুলো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ করলেও তাদের মধ্যে অব্যাহত শিক্ষা বা জীবনভর শিক্ষার আয়োজন এখনও খুব কম সংস্থারই আছে। ফলে যে পরিমাণ বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে কতটা টিকে থাকছে বা ব্যবহারিক কাজে লাগছে তা স্পষ্ট করে বলা শক্ত। অবশ্য এর একটা কারণ হল দেশে বয়স্ক শিক্ষার ছ'সাত দশকের ঐতিহ্য আছে; কিন্তু অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচির তেমন কোন ঐতিহ্য নেই। কিছু কিছু সংস্থা, যেমন ব্র্যাক, গ্রামবান্ধব ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন—এধরনের কর্মসূচির জন্য পাঠ্য উপকরণ তৈরি করতে শুরু করেছে। দেশে অনেক দিন থেকে কিছু কিছু শিশু-কিশোর সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু এসব প্রধানত শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাহিদার কথা মনে রেখে তৈরি; কিশোর-কিশোরী ও বয়স্কদের জন্য তেমন কোন উপকরণ এখনও ব্যাপক আকারে তৈরি শুরু হয় নি।

জীবনভর শিক্ষার একটি প্রধান উপায় হতে পারে গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন বয়স্ক শিক্ষা সার্থক করে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। এরকম পাঠাগারের নমুনা হল বাক্স-লাইব্রেরি, খুদে লাইব্রেরি ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। সচরাচর এসব লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ অতিমাত্রায় ছোট; তাছাড়া তাদের সাংগঠনিক ব্যবস্থাও তেমন মজবুত নয়। তাই পাঠাগার আন্দোলন দেশে এখনও তেমন দানা বাঁধতে পারে নি। যে সব উপকরণ এযাবৎ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ, রুজি-রোজগার এসব বিষয়ে বই-পুথি। কিছু চিরায়ত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপ, রূপকথা, শিশুপাঠ্য গল্প-কাহিনী এসব ধরনের উপকরণও রয়েছে।

জীবনভর শেখার কাঠামো

দেশে আজ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোটামুটি ত্রিশ লাখ; তার মধ্যে মাত্র দশ লাখ হল বয়স্ক মানুষ। অথচ মোট নিরক্ষর বয়স্ক মানুষের সংখ্যা হল অন্তত চার কোটি। কাজেই এ হারে চললে আজকের নিরক্ষরদের সাক্ষরতা দিতেই কেটে যাবে অন্তত চল্লিশ বছর সময়। আর আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পুরোপুরি সাক্ষর হবার আগেই ঝরে পড়ছে তাদের যদি ধরা যায় তাহলে এই সময় কম করেও এর দ্বিগুণ হবে। আসলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া পুরোপুরি বন্ধ করা দরকার। শুধু যে প্রাথমিক স্তরেই প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে তা নয়, প্রতি বছর মাধ্যমিক শিক্ষারও নানা স্তর থেকে বহু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবন ও জীবিকার জন্য ঠিকমতো তৈরি হতে পারছে না। তাদেরও প্রতিভা আর কর্মদক্ষতার বিকাশের জন্য দরকার নানা ধরনের অব্যাহত শিক্ষা বা সঞ্জীবনী শিক্ষার আয়োজন।

এসব বিবেচনা থেকে বোঝা যাবে আজকের তথ্যযুগের চাহিদা মেটাতে হলে দেশে জরুরি ভিত্তিতে নানা ধরনের অনুসারক ও অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে:

১. **উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি** : তারা হতে পারে শিশু, কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক মানুষ; কেউ হবে মেয়ে, কেউ ছেলে। এমনি সব নানা ধরনের শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ চরিত্র আর পটভূমির কথা মনে রাখতে হবে।

২. **উদ্দিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিশেষ আগ্রহ, রুচি, চাহিদা** : নানা ধরনের শিক্ষার্থীদের দেহগত ও মানসিক বিকাশে ভিন্নতা থাকবে, ভিন্নতা থাকবে তাদের বৃত্তিগত বা বিনোদন চাহিদার; সে সব ভাল করে যাচাই করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সচেতনা সৃষ্টি বা জীবনভর শিক্ষার কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

৩. **কি ধরনের উপকরণ আর পদ্ধতি দরকার :** কি ধরনের ভূমিকা হবে বই, পাঠাগার, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের? কি ধরনের বিষয়বস্তু, ভাষা আর চিত্রসজ্জা নানা ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য সবচাইতে যুতসই আর আকর্ষক হবে? কিভাবে সে সব তাদের কাছে পৌছনো যাবে সে কথাও বিবেচনা করতে হবে।

৪. **কি ধরনের সামাজিক আর প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আসছে :** যে সব পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে সেগুলো কি সব আমরা ঠেকাতে চেষ্টা করব? না কি সেগুলোকে আমাদের জীবনভর শেখার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে? নতুন নতুন যোগাযোগ মাধ্যমের কি ভূমিকা থাকবে তাতে?

এমনি সব নানা বিবেচনা থেকে দেশে অব্যাহত শিক্ষার আয়োজন করার জন্য কতকগুলো কর্মসূচি নেওয়া দরকার। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি আজকের সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য বা উপযোগী বিবেচিত হতে পারে:

- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের ব্যবস্থা :** যে সব বেসরকারি সংস্থা আজ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাদের উৎসাহ আর সহযোগিতা দিয়ে এধরনের কাজের আরো প্রসারের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সব বেসরকারি সংস্থা আজ জীবনভর শিক্ষার কর্মসূচিতে জড়িত নয় তাদের এ কাজ শুরু করতে উৎসাহিত করতে হবে। সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি সম্পদ বরাদ্দ করে তার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে; সে সম্পদ যাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাও দেখতে হবে।

- **উন্নত কাঠামো, উন্নত শিক্ষাক্রম আর উপকরণ:** বিভিন্ন ধরনের আর বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উপযুক্ত পদ্ধতি আর উপকরণ কি হবে সে সব বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা প্রয়োজন। গবেষণা করতে হবে নানা স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার উপকরণ তৈরির বিষয়েও।

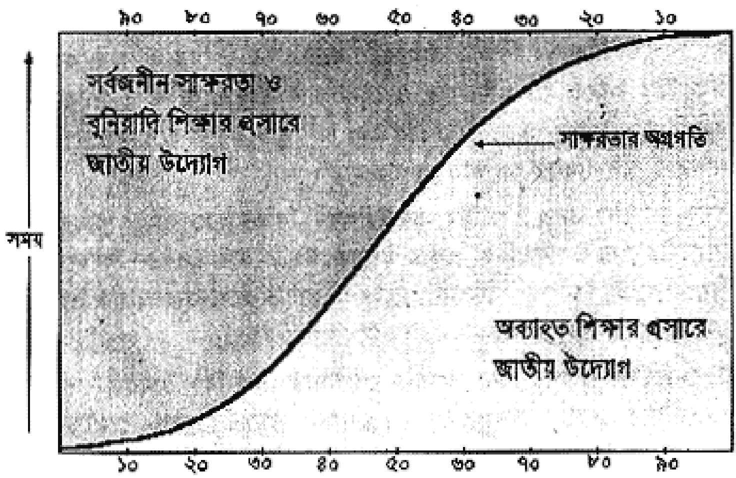
- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পেশাদার শিক্ষাবিদ তৈরি :** দেশে আজ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য পেশাদার শিক্ষক আর বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, কিন্তু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য এধরনের বিশেষজ্ঞ তৈরির কোন বড় আকারের উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয় নি। অথচ এটি একটি নতুন ক্ষেত্র: এর জন্য দরকার নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ, নতুন ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী—যেমন শিক্ষকদের জন্য, তেমনি ব্যবস্থাপক, সমন্বয়ক, তত্ত্বাবধায়কদের জন্যও।

- **দেশব্যাপী শিক্ষার আন্দোলন:** দেশে শিক্ষাসহায়ক পরিমণ্ডল রচনার জন্য দরকার বড় আকারের একটা শিক্ষার আন্দোলন। এই আন্দোলনে অবশ্যই থাকবেন

শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীরা, তেমনি তাতে থাকবেন যোগাযোগ মাধ্যম, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, রাজনৈতিক অঙ্গন, নাগরিক সমাজ —এমনি আরো নানা ক্ষেত্রের কর্মী।

বাংলাদেশে আজকের শিক্ষা বিকাশের স্তরে সাক্ষরতা-পরবর্তী অনুসারক শিক্ষাই হবে অব্যাহত শিক্ষার প্রধান ধারা। এই ধারায় এক ধরনের শিক্ষা হবে প্রাগ্রসর সাক্ষরতা দেওয়া; আরেকটা হবে এমন শিক্ষা যা নব্যসাক্ষরদের উচ্চতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যেতে সহায়তা করে। তেমনি থাকতে পারে নানা ধরনের উৎপাদনমূলক উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া এবং শিক্ষার্থীদের জীবন মানের উন্নয়নে সহায়ক কর্মসূচি। তাছাড়া আরো হতে পারে এমন ধরনের শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের বই পড়তে, নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে উৎসাহিত করে, তাদের মধ্যে একটা দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

চিত্র ৬ : সর্বজনীন সাক্ষরতা প্রসারের গুরুত্ব ক্রমেই কমে আসবে; বাড়তে থাকবে অব্যাহত শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ



গ্রামীণ পরিমণ্ডলে এমনি জীবনভর শিক্ষার কাঠামোতে 'লোককেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। গ্রামে এসব লোককেন্দ্র হতে পারে জীবনভর শিক্ষা আয়োজনের মূল কেন্দ্র, গ্রামের মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজের মিলনক্ষেত্র, তাদের অব্যাহত অগ্রগতির, ক্ষমতায়নেরও কেন্দ্র।

দেশে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার আগামী দিনে ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকবে; তেমনি জীবনভর শিক্ষার চরিত্রও ক্রমে ক্রমে বদলে যেতে থাকবে। তবে মূল কথাটা হচ্ছে সারা পৃথিবী আজ শিক্ষা আর তথ্যের হাতিয়ার নিয়ে যে গতিতে এগিয়ে চলেছে সে তুলনায় আমরা অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। দুনিয়ার সঙ্গে সমান তালে এগোতে হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এগোবার হার আজকের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ানো দরকার।

আমরা যদি স্থাণু হয়ে বসে থাকি তাহলেই সারা পৃথিবী স্থির হয়ে থাকবে না। নতুন একুশ শতককে সামনে নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিশাল আর উজ্জ্বল সম্ভাবনার জগৎ আমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তার জন্য জীবনভর শেখার আয়োজন ছাড়া আগামী পৃথিবীতে টিকে থাকার আর কোন সহজ পথ নেই।

চাওয়া-পাওয়ার হিসেব

শিক্ষার কাছে কী চাই

মানুষের আদিম সমাজে এক ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয় ছিল যদিও তা অবশ্যই আজকের মতো এমন ব্যাপক আকার নেয় নি। আর এই শিক্ষা ব্যাপারটা যে শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাও নয়; তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই আজকের পশুপাখির দিকে তাকালেও। অনেক প্রাণীর শাবক শৈশবে থাকে একেবারে অসহায়, বাবা-মা তাদের শিকার ধরতে শেখায়, পথ-ঘাট শত্রু-মিত্র চিনিয়ে দেয়। কিন্তু পশু-পাখির চেয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, জ্ঞানের সঞ্চয় অনেক বেশি; তাই তার শিক্ষার ব্যবস্থাও বেশি জটিল। তার ওপর মানুষের সমাজ সভ্যতার পথে যত এগিয়েছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার তত বেড়েছে, শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়ে উঠেছে তেমনি বিস্তৃত আর জটিল।

আমাদের দেশের প্রাচীনকালের আর আজকের দিনের সমাজের দিকে তাকালেও আমরা এই তফাতটা বেশ বুঝতে পারি। প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে বেশ বিস্তৃত একটা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা ছিল অতি সাদাসিধে ধরনের। একজন গুরু বা ওস্তাদের কাছে গুটিকয়েক শিষ্য বা সাগরেদ লেখাপড়া করত। প্রথম প্রথম লেখাপড়া ছিল প্রধানত মুখে মুখে শেখা; তারপর এল তালপাতায় বা তুলট কাগজে হাতে লেখা পুথি। আর শেখা মানে হল প্রধানত মুখস্থ করা; কখনো তার সঙ্গে শিখতে হত 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এমনি ধারার তর্কের কূটজাল। কী ইউরোপে, কী এই উপমহাদেশে বিদ্যাচর্চা বলতে বোঝাত প্রধানত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। সেখানে প্রশ্ন করার বা যাচাই করার সুযোগ কম, বিশ্বাসের ভাগ বেশি; কাজেই মুখস্থ করা আর নানাভাবে ব্যাখ্যা করা ছাড়া শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর আর কিছু করবার স্বাধীনতাও ছিল খুব সীমিত। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে কেউ যদি এমন কোন সত্য উদ্ঘাটন করত যা পুরনো ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না তাহলে সেকথা প্রচার করা সব সময় নিরাপদ ছিল না।

শিক্ষার আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তা প্রধানত সমাজের উঁচু তলার মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কোন কোন ধর্মমতে এই সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ছিল বেশ কঠোর; যেমন প্রাচীন আর্যসমাজে। আবার কোথাও সেটা ছিল অনেকটা শিথিল; যেমন বৌদ্ধ ধর্মে বা ইসলাম ধর্মে। ইসলামে বিদ্যাচর্চা সবার জন্য ফরজ বলা হলেও বাস্তবে আজকের অনেক মুসলিম-প্রধান দেশে নিরক্ষরতার হার ব্যাপক। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন ইংরেজরা এদেশে এল তখন তারাও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে প্রধানত এদেশের অভিজাত সমাজের লোকদেরকে। অবশ্য আজ গণতন্ত্রের ধারণা প্রসার লাভ করায় এ অবস্থা অনেকটা বদলে গিয়েছে; জ্ঞানচর্চার ওপর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষের সমানাধিকার আজ পৃথিবীর সভ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার যে একটা সমাজ ও সে সমাজের মানুষকে কত দ্রুত আর কী বিরাটভাবে বদলে দিতে পারে সেটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছিল ১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে গিয়ে। সেখানকার অবস্থা দেখে তিনি বলেছেন :

> আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল—তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত। যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক। যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল—তারা সমাজের অন্ধকুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এতকালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। (রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৩)

আর সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে পড়েছিল নিজের দেশ পরাধীন ভারতে শিক্ষার সীমাহীন দৈন্যের কথা। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে দীনতা সেদিন রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়েছিল এই প্রায় সাত দশক পরেও মনে হয় তা যেন আজো হুবহু একইভাবে সত্য।

মানুষের সমাজ বিকাশে শিক্ষার যে বিপুল গুরুত্ব তা যুগে যুগে নানা মনীষী, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারক, সমাজনেতার চোখে ধরা পড়েছে। সেই আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত শিক্ষাতত্ত্ব নিয়ে, ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি, শিক্ষা কি, কেন, কার জন্য, কিভাবে—এমনি সব নানা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কম হয় নি।

তবে এসব চিন্তা-চেতনা থেকে এদেশে আমরা যে খুব একটা লাভবান হয়েছি তা বলা শক্ত। কেননা লাভবান হলে বাংলাদেশের মানুষের আজ এই দীন দশা থাকবার কথা ছিল না। অন্য সব দেশ যখন শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সভ্যতার অগ্রযাত্রায়

বিপুল বেগে এগিয়ে চলেছে তখন আমরা যেন থেকে যাচ্ছি যে-অন্ধকারে ঢাকা ছিলাম সেই অন্ধকারেই। এই শতকের শুরুতে ইংরেজ মনীষী এইচ.জি. ওয়েল্‌স্‌ বলেছিলেন, সভ্যতা আর সর্বনাশের মাঝখানে যা দাঁড়িয়ে তা হল শিক্ষা। এদেশে রাষ্ট্রনায়ক থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত যে কোন লোকের মতামত বিচার করলে মনে হবে আমরা যতটা না দাঁড়িয়ে সভ্যতার কাছে তার চেয়ে অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছি সর্বনাশের। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যাপারটাকে আমাদের প্রয়োজনমতো ঢেলে সাজানো আর সেই ঢেলে সাজানো শিক্ষাব্যবস্থাকে সারা দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আসন্ন সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তির কোন পথ আছে বলে মনে হয় না।

শিক্ষার লক্ষ্য নানা চোখে

আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে গ্রীক সভ্যতাকে। আজকের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-সামাজিক অনেক চেতনার বিকাশ ঘটেছে মূলত প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার গ্রীক মনীষীদের চিন্তাপদ্ধতিকে ভিত্তি করে। এই গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা শিক্ষার ওপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর এ ঐতিহাসিক সত্যটিকে কিছুতেই ভোলা যায় না যে, সেকালের গ্রীক সেনাপতি বা রাষ্ট্রনায়কদের কথা লোকে যতটা না মনে রেখেছে তার চেয়ে অনেক বেশি মনে রেখেছে সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক দার্শনিক-পণ্ডিতদের কথা। এঁরা নিজেরা শিক্ষক ছিলেন এবং বহুমুখী শিক্ষাকর্মে ধারাবাহিক পরম্পরায় যুক্ত থেকে নানা শিক্ষাতত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন।

সক্রেটিসের (৪৭০-৩৯৯ খ্রিঃ পূঃ) চোখে শিক্ষা হল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে সত্যের সন্ধান; এই সত্য উদ্‌ঘাটনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একই পথের সহযাত্রী। আর মানুষ তো কেবল সামান্য ব্যক্তিমাত্র নয়, সে হল মানব জাতির সামগ্রিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিজের জীবন দিয়ে দ্বন্দ্বমূলক জিজ্ঞাসা-প্রতিজিজ্ঞাসার যে যুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি সক্রেটিস প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তা আজও জ্ঞানানুসন্ধানের একটি প্রধান ভিত্তি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সক্রেটিসের অন্যতম শিষ্য প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ) জ্ঞানচর্চার ফল হিসেবে দেখেছেন আত্মোপলব্ধি আর তার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার সুসমঞ্জস বিকাশ, বৃদ্ধি আর সুপরিণতি। তিনি এই জ্ঞানচর্চার পথে চারটি পর্যায় বা স্তরের কথা বলেছেন : প্রথম স্তরে রয়েছে জানা, দ্বিতীয় স্তরে আস্থা, তৃতীয় স্তরে স্বরূপ-অন্বেষা, চতুর্থ স্তরে সমাধান ও নিশ্চয়তা।

প্লেটোর সেরা শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃ পূঃ) শুধু যে মহাবীর আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন তা নয়, জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রভাব দু'হাজার বছর ধরে ছিল অপ্রতিহত। অ্যারিস্টটল শিক্ষাকে দেখেছেন মানুষের সুপ্ত

শক্তির বিকাশ সাধনের পন্থা হিসেবে; আর সেজন্য শিশুর রুচি, কল্পনা, বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধকে সুমার্জিত ও সুশৃঙ্খল করতে হলে যেমন প্রয়োজন শেখার বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা তেমনি তার মধ্যে চাই আদর্শগত ঐক্য। বাস্তববাদী দর্শনের অনুসারী অ্যারিস্টটলের মতে অভিজ্ঞতাই হল সকল জ্ঞানের উৎস এবং ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানই আমাদের যৌক্তিক জ্ঞান দেয়।

শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণার বিকাশ ঘটাবার ক্ষেত্রে আরো যে সব দার্শনিক অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জঁ-জাক রুসো (১৭১২-৭৮)। আঠার শতকের এই প্রকৃতিবাদী বিপ্লবী চিন্তানায়ক সকল কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত স্বাভাবিক পথে মানুষের শৃঙ্খলহীন বিকাশের কথা বলেছেন। প্রকৃতিই হল সবচেয়ে বড় শিক্ষক। এই প্রকৃতির অঙ্গনে স্বাধীন বিকাশেই মানুষের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষারপদ্ধতির ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

রুসোর প্রকৃতিনির্ভর শিক্ষার ধারণায় মনস্তত্ত্বের যোগ ঘটালেন আঠার শতকের শেষভাগে সুইস্ শিক্ষাবিদ ইওহান হাইনরিক পেস্তালৎসি (১৭৪৬-১৮২৭)। অনাথদের জন্য শিক্ষালয় পরিচালনা করতে গিয়ে পেস্তালৎসি উদ্‌ঘাটন করলেন শিশু-মনস্তত্ত্বের এক আশ্চর্য জগৎ। 'প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী' এই মতবাদের ভিত্তিতে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে তাঁর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি একই সঙ্গে শিশুর হাত, মস্তিষ্ক আর অনুভূতির বিকাশে উদ্যোগী। পেস্তালৎসির সুযোগ্য শিষ্য জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রেডরিক ফ্রোয়বেল (১৭৮২-১৮৫২) শিশুর স্বাধীন বিকাশে তার আগ্রহ, ইচ্ছা আর ক্রীড়া প্রবৃত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। এই ধারা অনুসরণ করে শিশুশিক্ষার জন্য কিন্ডারগার্টেন বা 'শিশু-কানন' নামে শিক্ষা পদ্ধতির তিনিই প্রথম প্রবর্তক।

বিশ শতকে পশ্চিমী জগতের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে মার্কিন শিক্ষাবিদ জন ডিউই-র (১৮৫৯-১৯৫২) ভাবধারা। ডিউই শিক্ষাব্যবস্থায় চলমান জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষা শুধু আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নয়, বর্তমান জীবনযাপনের কলাও তার আওতাভুক্ত। কাজেই প্রতিটি বর্তমান অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলা, সেসব অভিজ্ঞতা থেকে তাৎপর্য আহরণ করাই শিক্ষার লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্য অর্জন সমাজকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। কেননা ব্যক্তি মানুষকে নিয়েই সমাজ আর ব্যক্তির সকল অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল সমাজ ও পরিবেশের ওপরে। কাজেই জীবনের সঙ্গে, সমাজের ও পরিবেশের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই তা অর্থহীন। শুধু জ্ঞান আর কলাকৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা নয়; জীবন, পরিবেশ ও সমাজের প্রয়োজনে তাকে নিয়োগ করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

বিশ শতকে আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) প্রমুখ দার্শনিকও এমনি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা, সমাজমুখী, প্রয়োগমুখী শিক্ষার

ওপর জোর দিয়েছেন। হোয়াইটহেড-এর একটি বিখ্যাত উক্তি : "জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহারের শৈলী আয়ত্ত করাই হল শিক্ষা।" আবার 'শিক্ষার ছন্দ' নামে বইতে তিনি বলেছেন, বুদ্ধি বিকাশের ধারায় তিনটি স্তর পেরোতে হয় : রোমান্সের স্তর, যথার্থতার স্তর, তারপর আসে সাধারণীকরণের স্তর।

অনেকটা একই ধরনের শিশুকেন্দ্রিক, সমাজকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষা দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বিশ শতকের একেবারে শুরুতে শান্তিনিকেতনে শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে তিনি শিক্ষা বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন আর সেখানে তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে যাচাই করে নিয়েছেন জীবনের কষ্টিপাথরে। প্রকৃতির সঙ্গে মেশামেশি তাঁর এই আদর্শ শিক্ষাঙ্গনের ধারণা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "... আমি আকাশ আলোর অঙ্গশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে।"

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে দেখেছেন জীবনেরই এক অতি আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসেবে, অর্থাৎ জীবনের যা আদর্শ, শিক্ষারও আদর্শ তাই। তিনি বলেছেন, "শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং কী শিখিব, এ দু'টি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।" (শিক্ষা, পৃঃ ৭১)। শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে জন ডিউই-র 'কর্মভিত্তিক শিক্ষা' দানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের আশ্চর্য মিল দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সাহচর্যে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত তাদের দেহ আর মনকে বিকশিত করে তুলবে—তাই হবে তাদের শিক্ষার ভিত্তি। তাঁর শিক্ষা হল এমন শিক্ষা যার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া : "আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।" (পল্লীপ্রকৃতি)

দেশ-কালের সমন্বয়

সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল যে সময়ে তাঁদের শিক্ষাতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন তার তুলনায় আজকের সময় নিঃসন্দেহে অনেক বদলেছে। রুসো-পেস্তালৎসি-ফ্রোয়বেলের সময়ের চেয়ে প্রকৃতি, পরিবেশ আর সমাজ আজ অনেকাংশে ভিন্নতর, এমন কি ডিউই-হোয়াইটহেড-রবীন্দ্রনাথের কালের চেয়েও আজ আমাদের চারপাশে অনেক দ্রুত গতিতে রূপান্তর ঘটে চলেছে। সময়ের পরিবর্তন যে এসব দার্শনিক ধারণার সব কিছুই তাৎপর্যহীন করে তুলেছে তা নয়, তাঁদের তত্ত্বের অনেক উপাদানই আজও হয়ে রয়েছে কালজয়ী। কিন্তু সেই সঙ্গে এসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা আর তার রূপায়ণ নিশ্চয়ই অনেকখানি নির্ভর করবে স্থান-কাল-পাত্রের ওপরে।

আজ যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ, দ্রুত পরিবর্তনশীল কালের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার একটি বড় লক্ষণ এই যে, শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য আর পদ্ধতি নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠছে সারা পৃথিবী জুড়ে। প্রশ্ন উঠছে শিক্ষাব্যবস্থার দক্ষতা নিয়ে, জাতীয় আদর্শের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সাযুজ্য নিয়েও। বিভিন্ন দেশে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি, কমিশন গঠিত হচ্ছে; তাঁরা দীর্ঘ প্রতিবেদন ও সুপারিশমালা প্রস্তুত করছেন, কিন্তু সময়ের দ্রুত পরিবর্তনে অনেক সময় সে সব বাস্তবায়ন করা হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য। বিগত কয়েক দশকে যে সব ঘটনা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে তাদের এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

১. বিপুল সংখ্যক দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বিকাশের পথ ধরেছে; সেসব দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের দিকে সবার দৃষ্টি পড়েছে।

২. জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধারণা বিস্তার লাভ করেছে। সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে আর আগের মতো শুধু ওপর তলার অভিজাত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

৩. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যবিপ্লব আজ সকল মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে; শিক্ষাক্রম, উপকরণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছে।

৪. বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে; তার ফলে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখার প্রবণতা বেড়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের মনে আর্থ-সামাজিক বিকাশের এবং সেই সঙ্গে শিক্ষালাভের আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠেছে। শিক্ষার চাহিদা এবং এক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত সম্পদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে। এর ফলে ঔপনিবেশিক কালে যে সীমাবদ্ধ শিক্ষার ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল সে ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে যেন ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ ব্যাপকভাবে তথ্যের আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে; এর আগে কখনো এমন ব্যাপক আকারে তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব ছিল না। বিপুল হারে নতুন জ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে। সেসব জ্ঞান ও তার প্রয়োগ ত্বরিৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এর ফলে শুধু যে ক্রমাগত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তা নয়, শিক্ষণতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণারও পরিবর্তন ঘটছে। আজ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে নিছক

কিছু বিষয়বস্তু শেখা নয়, কি করে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ক্রমাগত নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত করা যায় সেটা শেখা।

সত্তরের দশকের শুরুতে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ফরাসি দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এদগার ফ'রে (Edgar Faure)-কে সভাপতি করে শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করেছিলেন; তাঁরা একালের কয়েকটি বিশিষ্ট চারিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে :

১. ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষার অগ্রগতির ফল হিসেবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা থেকে এমনি ফল পাওয়া গিয়েছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ত্যাগ স্বীকার করে হলেও এই পথ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে।

২. ইতিহাসে এই প্রথম শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের এমন এক ধরনের সমাজের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে যা এখনো অনাগত। প্রাচীনকালে দীর্ঘকাল ধরে সমাজের যে স্থিতি দেখা যেত আজ দ্রুত সামাজিক রূপান্তরের ফলে তার অবসান ঘটেছে। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর অভাবিতপূর্ব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।

৩. ইতিহাসে এই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ অনেক শিক্ষার্থীকে সমাজ তার প্রয়োজনের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করছে। স্পষ্টতই সমাজের চাহিদা দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না।

স্বভাবতই এসব নতুন পরিস্থিতি অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরও ছাপ ফেলতে আরম্ভ করেছে। তার ফলে যেমন একদিকে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে বুনিয়াদি শিক্ষার স্তরে দেশের সব মানুষকে শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনবার, তেমনি প্রয়োজন হয়ে উঠছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর উঁচুমানের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষার এবং সব মানুষের জন্য জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার আয়োজনের।

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক আবার নব্বইয়ের দশকের শুরুতে (১৯৯৩) বিশিষ্ট ফরাসী বুদ্ধিজীবী জাক দেলর (Jaques Delors)-কে সভাপতি করে নিয়োগ করলেন 'একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন'। এই কমিশন তাঁদের রিপোর্টের নাম দিয়েছেন "শেখা: ভেতরের যে সম্পদ"; রিপোর্টটি ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের নিজে নিজে শেখার ওপরে। কমিশন যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার চারটি প্রধান স্তম্ভ নির্দেশ করেছেন: জানতে শেখা, করতে শেখা, বাঁচতে শেখা আর মিলেমিশে বাস করতে শেখা। এই চারটি ভিতের ওপর প্রত্যেক মানুষকে সারা জীবন ধরে শিখে যেতে হবে; শেখার ব্যাপারে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের একটা

ভূমিকা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আসল শেখাটা ঘটবে শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টায়। আর সে শেখা যে শুধু তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান আর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে তা নয়, সৃষ্টি করবে তার বিশ্লেষণক্ষমতা আর কাজ করবার ক্ষমতাও।

আমাদের শিক্ষা কেমন হবে

রবীন্দ্রনাথের জবানিতে আমরা জেনেছি কোনো জনগোষ্ঠীর চোখে জীবনের যা আদর্শ তাদের শিক্ষার আদর্শও তারই অনুসারী। বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের একটি বেদনাদায়ক সত্য এই যে, এদেশে আজো কোন সর্বসম্মত জাতীয় আদর্শ দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। বিগত কয়েক দশকে এদেশে বিভিন্ন সময়ে যে সব শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকেই এই আদর্শগত অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান যুগের প্রথম দিকে যে ইসলামী জীবনধারাকে জাতীয় আদর্শ বলে গণ্য করা হয়েছিল, ১৯৫৯ সালের শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল তারই ওপর ভিত্তি করে। আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের সংবিধানে যে চারটি জাতীয় মূল নীতি গৃহীত হয়, ১৯৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন স্বভাবত তারই ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছিল। তারপর বিভিন্ন সময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যেসব চেষ্টা হয়েছে প্রধানত জাতীয় আদর্শের অস্পষ্টতার কারণে তার সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার ছ'মাসের মধ্যেই তখনকার সরকার এক জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নই ছিল এই কমিশনের প্রধান দায়িত্ব। কমিশন এদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের অনুসরণ করে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন নিচের বিষয়গুলো :

১. **দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব** : এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধ সঞ্চার, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি। ... এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

২. **মানবতা ও বিশ্ব-নাগরিকত্ব** : মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

৩. **নৈতিক মূল্যবোধ** : শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থী কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান,

নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা : প্রত্যেক মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তার বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৫. প্রয়োগমুখী ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা : একটি দেশের সকল স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজনের ফলেই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক বিকাশ সম্ভব হয়; সে বিকাশকে দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে তোলা প্রয়োজন।

৬. নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা : সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়—উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে।

এই শিক্ষা কমিশনের কাজ চলার সময়েই সরকার একটি আইনের মাধ্যমে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কমিশনের সুপারিশের ওপরে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে আর এগুলো কার্যকর করার তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। শুধু কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সত্তরের দশকের শেষে প্রাথমিক স্তর ও আশির দশকের গোড়ায় মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রবর্তন করা হয়। ইতোমধ্যে ১৯৭৯ সালে বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রণীত হয় একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি। তারপরও আরো গোটা কয়েক শিক্ষানীতির কথা শোনা গিয়েছে। এসবের মধ্যে কোনটি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কোনটি প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ; আবার কোনটি বা শুধু নথিবন্দী হয়ে আছে।

১৯৮৭ সালে অব্যাহত ছাত্র আন্দোলনের মুখে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংস্কার কার্যসূচি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে ড. মফিজউদ্দিন আহমদকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করে এবং তার ওপর আগের সব শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সমন্বিত সুপারিশ প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয়। কমিশন ১৯৮৮ সালে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে 'শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা' অধ্যায়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু সত্যভাষণ দেখতে পাওয়া যায় :

> বর্তমান শতকেরই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে আমাদের তরুণ ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক আহ্বানে প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছিল। শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে তারা রাজপথে নেমেছে; অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।

এসকল আন্দোলনের মাধ্যমে তারা গৃহীত হয়েছে জাতির প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে। ... বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারাই ছিল পুরোভাগে। সমস্যাক্লিষ্ট জাতি তার নির্ভরতার ভিত হিসাবে দেখেছে ছাত্রসমাজকে। ... স্বাধীনতা-উত্তরকালে লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা, গুণ ও মেধার যথাযথ স্বীকৃতির অভাব, সম্পদ লাভে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিরোধী শক্তি এককালের উদ্দীপ্ত জনশক্তিকে অবাঞ্ছিত পথে প্রলুব্ধ করেছে। অতীত তাদের কাছে অর্থহীন, বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; জীবিকার ক্ষেত্রে সমাজ এদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ... আমাদের তরুণদের মধ্যে অসন্তোষজনিত যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ লক্ষণীয় তার জন্য অনেকাংশে দায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মূল্যবোধজনিত বিপর্যয় ও আদর্শহীনতা। (রিপোর্ট, পৃ: ৫৩-৫৫)

এই কমিশন আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলল, "বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। .." বলা বাহুল্য, এই রিপোর্টটির ভাগ্যও আগের অন্যান্য রিপোর্টের মতোই হল।

এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, নানা মতামতের দ্বন্দ্বের মধ্যেও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে কতকগুলো বিষয়ে তেমন কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই। জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্যের ভিত্তি হতে পারে এমন ক'টি বিষয় হল : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা; জাতীয়তার বোধ; গণতন্ত্রের অনুশীলন; সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ; দেশ থেকে নিরক্ষরতার অবসান; সবার মেধা অনুযায়ী বিকাশের সমান সুযোগ; প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সমন্বয়; অন্তত প্রাথমিক বা বুনিয়াদি পর্যায়ে একমুখি শিক্ষা; জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সাযুজ্য; বিজ্ঞানমনস্কতা ও মুক্তচিন্তার বিকাশ; জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ ও তার উৎকর্ষ; জনশক্তিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা; মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি; সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতার স্ফুরণ; ও সমাজচেতনার বিকাশ। —স্বভাবতই এদেশের জন্য যে শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করা হবে তাতে এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-সংকট

বাংলাদেশে শিক্ষা-দর্শনের ক্ষেত্রে আজ যে সংকট তা মূলত জাতীয় আদর্শের ক্ষেত্রে সংকটেরই প্রতিফলন। নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্যে জাতীয় আদর্শে স্থির থাকা হয়ে উঠেছে দুঃসাধ্য। শিক্ষা-দর্শনের সংকট থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক সর্বব্যাপী জড়তা। মুখে আমরা সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলছি, কিন্তু যে হারে শিক্ষার প্রসার ঘটছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গেও তাল রাখতে পারছে কিনা সন্দেহ—অর্থাৎ স্বাধীনতাপূর্বকালে দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর আর বয়স্ক মানুষ যে তিমিরে থাকত আজো তারা রয়ে যাচ্ছে সেই তিমিরেই।

আমরা যখন জনগণের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের কথা বলি তখন ভোলা যায় না যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আজো নামমাত্র। আমরা বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার কথা বলি, কিন্তু নানামুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টানাপোড়েনে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে বই কমছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ে আমরা কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, কিন্তু হিসেব করে দেখছি না যে, আজো এদেশে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু বার্ষিক আবর্তক ব্যয় মাত্র চার ডলারের মতো—তা আশেপাশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এ পরিস্থিতিতে তরুণ সমাজ যদি বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয় তাহলে সেজন্য তাদের ওপরে দোষ চাপানো শক্ত।

মূল প্রশ্নটি তাই শিক্ষার কাছে আমরা কী চাই শুধু সে প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, সমগ্র দেশের আদর্শ আর লক্ষ্যের প্রশ্নটিও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। মূল জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অস্পষ্ট চিন্তা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা সমগ্র জনগণের বিকাশকে মূল লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলাম। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসেবে দেখা হয়েছিল। আজ প্রশ্ন জাগে সে লক্ষ্য আমাদের সামনে আজো আছে কি নেই। সকল আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ বলছেন একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ পন্থা হল সেদেশের জনশক্তিকে আজ ও আগামী দিনের সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তোলা; তাই শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ অন্য সকল ক্ষেত্রের চাইতে বেশি ফলপ্রদ। অথচ আমরা মোট দেশজ আয়ের যে অংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করছি তা এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোর আন্তর্জাতিক মানের অর্ধেকেরও কম।

তাই শিক্ষা কি, কেন আর কার জন্য এ প্রশ্নকে আজ সবার আগে আনা দরকার। সেই সঙ্গে আমাদের আজকের সমাজকে আমরা কোথায় নিতে চাই আর কোন্ পথে নিতে চাই সে প্রশ্নেরও মীমাংসা প্রয়োজন। এসব প্রশ্নের মীমাংসা না করে শিক্ষার বিষয়,

পদ্ধতি, উপকরণ ইত্যাদি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা সবার জন্য শিক্ষায় আগ্রহী ছিল না—তাদের শোষণযন্ত্র চালু রাখার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা বরং ছিল বিপজ্জনক। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদীরাও সংগত কারণেই সবার জন্য শিক্ষায় আগ্রহী হয় নি। স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যদি আগামী একুশ শতকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই তাহলে সে অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; উনিশ শতকের উপযোগী মানুষ আর শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে সে উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করা। আমাদের যে শক্তি আছে তারই চরম বিকাশ হবে, আমরা যা হতে পারি তা সম্পূর্ণভাবে হব—তাই হবার কথা শিক্ষার ফল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, দাসত্ব থেকে মুক্তির লক্ষ্য কি আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আজো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি?—এ প্রশ্নের জবাব আমাদের সবাইকে আজ খুঁজতে হবে।

জ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে যারা এদেশে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বুকের রক্ত ঝরিয়েছিল তাদের সংখ্যা হয়তো আঙ্গুলে গোণা যায়। এ ছাড়াও অবশ্য বহু ছাত্র-শিক্ষক-মেহনতি মানুষকে জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু সে সব শহীদ আর নির্যাতিতরা ছিলেন এদেশের আপামর মানুষেরই প্রতিভূ। সেদিন এই ভাষার আন্দোলনে নানাভাবে শরিক হয়েছিলেন দেশের সকল স্তরের মানুষ। তার ফলে ক্রমে ক্রমে বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে। আরো তাৎপর্যময় হল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের মনে জাতীয়তার বোধ দানা বেঁধেছে, ভাষার দাবি থেকে তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশেষে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে ।

আজ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভাষার আন্দোলন শুধু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির লক্ষ্যেই ছিল না। মূলত এর লক্ষ্য ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মেধা, মনন ও কর্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ; আপামর মানুষের জন্য সুস্থ, পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠা। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের এই ব্যাপক তাৎপর্য ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। জীবনের সর্বস্তরে বাংলা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলা ভাষাকে আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমী। আর সেই একই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সব রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম চলবে বাংলা ভাষায়, শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা হবে একমাত্র মাধ্যম।

বলাই বাহুল্য স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় সার্থকতা জনগণের জীবনে কল্যাণকর পরিবর্তন সাধনের মধ্যে। আজকের দিনে এই পরিবর্তন ঘটাবার সবচেয়ে বড় দু'টি

উপকরণ হল শিক্ষা আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল উৎকর্ষের মধ্য দিয়েই গত তিন শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা থেকে মানুষের আধুনিক জীবনযাত্রায় উত্তরণ ঘটেছে। আর যে সব দেশ এই উত্তরণ ঘটাবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সার্থকতা লাভ করেছে তারা তা করেছে নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলে, জনসম্পদের উন্নয়ন ঘটিয়ে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু সমাজের ছোট একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সমগ্র সমাজে উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় দেশের সব মানুষের জীবনে প্রাচুর্য সৃষ্টি। দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যকে অবারিত করে দিতে হবে সকল স্তরের মানুষের জন্য। আর ঠিক এজন্যই প্রয়োজন মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার আয়োজন আর ব্যাপক আকারে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা।

পরাধীনতার যুগে এদেশের সম্পদ প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে বিদেশীদের কল্যাণে, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধির স্বার্থে। দেশের সাধারণ মানুষের জীবন চিরকাল থেকেছে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। স্বাধীনতা আমাদের এনে দিয়েছে সমগ্র জনসমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে এই জনসম্পদের বিকাশ ঘটানো হলে এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ কাজে লাগাতে পারবে তাদের জীবনে সমৃদ্ধি আনবার জন—বাড়বে ফসলের উৎপাদন, জুটবে উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য, যথেষ্ট পরিমাণ বস্ত্র, উপযুক্ত আশ্রয়, নিরাময়যোগ্য ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি; প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে মানুষের জীবন।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনের প্রায় চার যুগ আর স্বাধীনতার দু'যুগ পরে কতদূর এগোতে পেরেছি আমরা এপথে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কি দেশময় ব্যাপ্ত হয়েছে আপামর মানুষের মধ্যে? জনগণের জীবনে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রয়োগ কি এনে দিয়েছে সুখ, সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের কল্যাণস্পর্শ?—স্বীকার করতেই হবে, আমাদের অগ্রগতি আজো তেমন ব্যাপক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় নি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আমাদের আরো বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হবে। শিক্ষার আলোকধারায় স্নাত করতে হবে দেশের সব মানুষকে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের জীবন আর চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে, সংস্কৃতির একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে।

অগ্রগতি কি কিছুই হয় নি?—কিছুটা নিশ্চয়ই হয়েছে। আজ আমাদের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক পর্যায়ে সব কিছু শেখানো হচ্ছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারে। শুধু পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, ভূগোল এসব বিষয় নয়, প্রযুক্তিগত নানা বিষয়েও বেশ কিছু বই বাংলায় লেখা হয়েছে। লিখতে গিয়ে প্রথম প্রথম পরিভাষা নিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা আর আজ

তেমন নেই। যেখানে বাংলা উপযুক্ত শব্দের অভাব সেখানে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় চালু হয়ে যাচ্ছে। রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, রেল স্টেশন, টেলিগ্রাম, কম্পিউটার এসব শব্দের বাংলা করার জন্য আজ আর কেউ পীড়াপীড়ি করবেন না। তেমনি বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা করতে গিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন, সার্কিট, ভোল্টেজ এধরনের শব্দ ব্যবহারেও কেউ বিব্রত বোধ করেন না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে উচ্চতর স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার উপযোগী বইপত্র তৈরি করা নিয়ে। এযাবৎ বাংলা একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে সব বই প্রকাশিত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য যেখানে অন্তত দেড়-দু' হাজার বই প্রয়োজন সেখানে তৈরি হয়েছে তার অর্ধেকেরও কম। তাছাড়া এসব বইকে নতুন নতুন সংস্করণের মাধ্যমে সমকালীন রাখবার সমস্যাও রয়েছে। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষার স্তরে সব বিষয়ে বাংলার মাধ্যমে পঠন-পাঠন সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যা যতটা না পরিভাষায় তার চেয়ে বেশি সামগ্রিক উদ্যোগ আর সংগঠনের।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কেন?

সচরাচর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে জীবনের নানা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণের সম্পর্ক আমাদের চোখে পড়ে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আমাদের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য নানা উপকরণ সৃষ্টি করে, উৎপাদন শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু এটিই এর একমাত্র দিক নয়, বরং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আরো বড় অবদান হল এর চর্চা আমাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে একটা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, অন্ধতা ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি দেয়, পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সাহস ও শক্তি সঞ্চার করে। পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে মানুষ অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে নিজের কর্মের ওপর, ভবিষ্যতের ওপর আস্থাবান হয়ে ওঠে। এই আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তখন জাতীয় অগ্রগতির পথে এগোতে গিয়ে সব বাধা প্রতিবন্ধক দূর করার একটি বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজকের দিনে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। একারণেই আজ পৃথিবীর সব দেশেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, বিশেষ করে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বলা চলে শুধু যে সব দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় বিশেষ জোর দিচ্ছে তারাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছে। বাংলাদেশের সীমাবদ্ধ পরিসর ও বস্তুসম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসম্পদই এদেশের প্রধান ঐশ্বর্য। এই জনসম্পদের যথাযথ বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। সেকালে আধুনিক বা তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারা ছিল অতি ক্ষীণ — সনাতন পদ্ধতিই ছিল শিক্ষার মূল ধারা। আজ বরং এর উল্টোটাই সত্যি। দেশের প্রাথমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর পনের শতাংশের মতো আজ সনাতন ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ছে; বাকি পঁচাশি শতাংশ রয়েছে আধুনিক ধারায়। মাধ্যমিক পর্যায়ে সনাতন ধারার শিক্ষার্থী মোটামুটি দশ শতাংশ। কিন্তু আমাদের যে আধুনিক শিক্ষার ধারা তাতেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অংশ আধুনিক জগতের চাহিদার তুলনায় অতিমাত্রায় ক্ষীণ।

এমন একদিন ছিল যেদিন একটি দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করত প্রধানত তার বস্তুসম্পদের ওপর : ভূখণ্ডের আয়তন, জমির উর্বরতা, খনিজ-বনজ সম্পদ এসবই ছিল দেশের সমৃদ্ধির প্রধান মাপকাঠি। আজ এ অবস্থা ক্রমেই বদলে যাচ্ছে; দেশের মানব সম্পদ, মেধা ও মননশক্তি বস্তুসম্পদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। বাংলাদেশ যে অতি দরিদ্র তার কারণ যতটা না তার বস্তুসম্পদের স্বল্পতা তার চেয়ে অনেক বেশি এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দীনতা, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগে ব্যর্থতা।

এদেশের ব্যাপক পশ্চাৎপদতার জন্য প্রায়শ আমরা দু'শতাব্দীব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের ওপর দোষারোপ করে থাকি; কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক শক্তির অপসারণের পরও যে আমরা নিজস্ব ভাষার চর্চায়, শিক্ষা বিস্তারে, জনসম্পদের উন্নয়নে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায় এবং সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে তেমন অগ্রসর হতে পারি নি তার পেছনে আমাদের নিজেদের অক্ষমতাও কিছু কম নয়। আজ যেখানে সারা পৃথিবীতে বয়স্ক সাক্ষরের গড়পড়তা হার সত্তর শতাংশের ওপরে, সেখানে বাংলাদেশে এই হার মাত্র ছত্রিশ শতাংশের মতো। এদেশে উচ্চ শিক্ষিত জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ; আবার তারও এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে : তাহলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার সঙ্গে বাংলাভাষার সম্পর্ক কি? — সম্পর্ক এই যে, আজকের দিনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চর্চা শুধু সমাজের গুটিকতক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সমগ্র দেশের, সব মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হলেই দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর দেশের সব মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বিস্তৃত হওয়া একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে যখন এসব বিষয়ের চর্চা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে তখনই জনগণের হাতে সত্যিকার ক্ষমতা পৌঁছবে, দেশ আধুনিকতার পথে অগ্রসর হবে এবং জনগণের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটতে থাকবে। আর এ সবই সম্ভব

শুধু দেশের সকল পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার অবারিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে।

দেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের উপযোগী ছেলেমেয়েদের প্রায় ৯০ শতাংশ এখন বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায়, যদিও তার মধ্যে নিয়মিত হাজিরা দেয় এবং প্রাথমিক স্তর শেষ করে মাত্র অর্ধেক। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর হার বয়ঃক্রমের মোটামুটি ২৬ শতাংশ। এই দু'স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে; অবশ্য আজকাল মাধ্যমিক স্তরের শেষ ধাপ পর্যন্ত বিজ্ঞান শেখে শিক্ষার্থীদের মাত্র এক-চতুর্থাংশ।

শিক্ষার প্রধান ধারা যে সাধারণ বিদ্যালয়গুলো তাতে বিজ্ঞান শিক্ষার ঐতিহ্য তেমন সবল নয়। ১৯৬১ সালে মাধ্যমিক স্কুলে বহুমুখী শিক্ষাক্রম চালু হলে তাতে ৯ম-১০ম শ্রেণীতে মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে সাধারণ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা হয়। বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্পকলা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে বিশেষ বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা চালু করা হয়। বিজ্ঞানের জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও পরীক্ষণের যন্ত্রপাতির অভাবে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে বহুমুখী শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রবর্তন এগোতে থাকে ধীর গতিতে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরে মাত্র এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী বিশেষ বিজ্ঞান শেখার সুযোগ পায়। নব্বইয়ের দশকের প্রথমভাগে মাধ্যমিকের শেষ পরীক্ষায় বিজ্ঞানসহ পরীক্ষার্থী মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যার মোটামুটি ৪০ শতাংশে ওঠে; কিন্তু তারপর সেটা কমতে কমতে ১৯৯৫ সালে আবার ২৭ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি ধারা হল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা; এটি এদেশে মূলত ষাটের দশকে চালু হয়। আট বছরের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করার পর দু'বছর মেয়াদী ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট বা ভি.টি.আই.-তে ভর্তি হওয়া যায়। এখন ৫১টি ইন্সটিটিউটে প্রায় ৩,৬০০ এবং ১২টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে প্রায় ৩,৬০০ শিক্ষার্থী এধরনের শিক্ষা লাভ করছে; এছাড়া ৩৩টি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটেও কিছু প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। প্রযুক্তিগত শিক্ষার পর্যায়ে ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে প্রায় ১৩,০০০ শিক্ষার্থী এসএসসি পাসের পর তিন বছর মেয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাছাড়া আছে কয়েকটি মনোটেকনিক ইন্সটিটিউট। সব মিলিয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের এক অতি সামান্য ভগ্নাংশ (এক-শতাংশেরও কম) এদেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা লাভ করে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এই হার খুবই কম; তাই এদেশে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির রয়েছে গুরুতর অভাব আর এটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনের পথে একটা বড় বাধা।

উচ্চশিক্ষার স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর হার আজ অতি নগণ্য। অথচ এই স্তরে দেশের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবী সৃষ্টি হচ্ছে। আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের সবচেয়ে বড় সমস্যা এই স্তর নিয়েই।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় যেমন, তেমনি উচ্চশিক্ষার স্তরেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর এযাবৎ আমাদের দেশে মোটেই আশানুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, অথচ জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার প্রসার একান্তই জরুরি। একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নতুন প্রতিষ্ঠিত ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে দেশে এখন মোট দু'ডজনের মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এছাড়া আছে আঠারটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল শিক্ষার চারটি ইন্সটিটিউট, তিনটি কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং আরো অন্যান্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সংখ্যা মোটামুটি এক লাখ। তার মধ্যে ছ'শতাংশের কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় ৬,০০০ সরাসরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া আর কিছু নিয়োজিত রয়েছেন নানা ধরনের সহায়ক ও সেবামূলক ক্রিয়াকর্মে। কিন্তু একে তো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়নে নিযুক্ত বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা খুব কম, তার ওপর তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছড়ানো নানা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে। গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ সম্পদও একান্ত অপর্যাপ্ত। এসব কারণে তাঁদের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতিতে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য ছাপ ফেলতে পারছে না।

ঐতিহাসিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মৌলিক বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌল ভূমিকা শুধু প্রচলিত জ্ঞানের প্রসার ঘটানো নয়, বরং গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি—এ ধারণা প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে উনিশ শতকের শুরুতে জার্মানিতে। এই ঐতিহ্য গত তিন শ' বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ই গ্রহণ ও লালন করেছে। তবে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন জ্ঞান, বিশেষ করে অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান—উদ্ভাবনের দায়িত্ব পালন নানা কারণে অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে :

১. যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের এবং তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যত্র যে সব নতুন আবিষ্কার ঘটছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার সুযোগের অভাব;
২. গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি, চলতি ব্যয়, বইপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি বস্তুগত সুবিধার গুরুতর সীমাবদ্ধতা;

৩. অনেক ক্ষেত্রে চালু রয়েছে পুরনো ধাঁচের শিক্ষাক্রম যাতে অনুসন্ধিৎসা বা সমস্যা সমাধানের চেয়ে চলতি জ্ঞানের আত্তীকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়;
৪. স্থানীয় বা আঞ্চলিক সমস্যার সঙ্গে গবেষণা কার্যক্রমের সম্পর্কহীনতা;
৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা, শিল্পসংস্থা ও অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রের সমন্বয়ের অভাব;
৬. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমনোযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য গবেষণাকর্মী না পাবার দু'টি প্রধান কারণ হল বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা এবং গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। মূলত এসব কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহু যোগ্য শিক্ষক ও গবেষক মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই যেখানে গবেষণার পরিবেশ এমন অনাকর্ষণীয়, সেখানে প্রায় ছ'শ, অধিভুক্ত ডিগ্রি কলেজে (তাদের মধ্যে দু'শ'র ওপর সরকারি ও প্রায় চার শ' বেসরকারি) এধরনের পরিবেশ প্রায় অনুপস্থিত বলা যেতে পারে। তুলনামূলকভাবে এসব কলেজে শিক্ষার্থীর সমষ্টিগত সংখ্যা বহুগুণে বেশি—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৭২,০০০ আর কলেজগুলোতে ডিগ্রিস্তরে প্রায় ৬৬০,০০। অথচ ডিগ্রি কলেজগুলোতে যেখানে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থীর হার ছিল মোটামুটি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ, সেটা কমতে কমতে ১৯৯৫ সালে নেমে এসেছে মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আমরা যে দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে মোটেই কোন উৎসাহের সঞ্চার করতে পারছি না এটা তারই একটি প্রমাণ।

উচ্চশিক্ষার স্তরে বাংলা বই

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক রচনা প্রধানত চার ধরনের হতে পারে : (১) পাঠ্যপুস্তকের রচনা, (২) গবেষণামূলক রচনা, (৩) অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ ও (৪) জনপ্রিয় রচনা। জনপ্রিয় রচনারও আবার নানা ধরন হতে পারে, যেমন বয়স্কদের উপযোগী, কৃষি প্রভৃতি পেশাজীবীদের উপযোগী, শিশু-কিশোরদের উপযোগী, রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যমের উপযোগী ইত্যাদি। এই সব ধরনের রচনাই আমাদের প্রয়োজন এবং এর জন্য ব্যাপক সংগঠিত উদ্যোগেরও প্রয়োজন। বাংলায় উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রধান দায়িত্ব এযাবৎ বাংলা একাডেমী পালন করছিলেন। কিছু কিছু প্রকাশক সংস্থাও সম্প্রতি এবিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকেও এ ধরনের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষাস্তরে বাংলায় বই তৈরির দায়িত্ব পালনের জন্য ষাটের দশকে (১৯৬৩) একটি কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এই বোর্ডটি বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। সে সময়ে একটি মোটামুটি হিসেব করা হয়েছিল উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলা প্রবর্তন করতে হলে নিম্নতম কতগুলো বই প্রয়োজন হবে। সে হিসেবে বলা হয়েছিল অন্তত ১,২০০ বই তৈরি হলে উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠন সম্ভব; এই সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ধরা হয়েছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই। ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের নানা নতুন নতুন শাখার উদ্ভব ঘটেছে, তার ফলে এই চাহিদার পরিমাণও বাড়ছে। এখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কমপক্ষে দু'হাজার বইয়ের প্রয়োজন; কিন্তু গত দু'দশকে তার অর্ধেকও প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। বাংলা একাডেমী যে সব বই প্রকাশ করেছে তাতে কোন কোন বিষয়ের বই প্রাধান্য পেয়েছে (যেমন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসা), আবার কোন কোন বিষয়ে এখনও তেমন অগ্রগতি হয় নি।

এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর মূল সমস্যা অর্থ ও জনবলের অভাব। সারা বছরে একাডেমীর বই প্রকাশনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয় তাতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ে ত্রিশ-চল্লিশটির বেশি বই (বছরে মোট প্রকাশিত বইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ) বের করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিজ্ঞানের বইয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল এ কাজের জন্য উপযুক্ত লেখক পাওয়া সহজ নয়। যাঁরা লিখতে পারেন তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অনেক কাজের মধ্যে বই-পুথি লেখার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। স্পষ্টতই বিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখা অর্থকরী দিক দিয়ে তেমন আকর্ষণীয় নয়। তাছাড়া এসব বইয়ের সম্পাদনাও একটি বিশেষজ্ঞ ধরনের কাজ। এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতা নেবার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেসব উদ্যোগের ব্যাপ্তি স্পষ্টতই এখনও তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নি।

সাধারণ সাহিত্যের বইয়ের তুলনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বইয়ের প্রকাশনার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ ধরনের সমস্যা রয়েছে। যেমন :

- পরিভাষার সমস্যা : বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বাংলা পরিভাষা এখনও প্রমিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বাংলা একাডেমী এক্ষেত্রে এযাবৎ যে উদ্যোগ নিয়েছে তা খুবই সীমিত। প্রাথমিক পর্যায়ে সব শব্দের বাংলা করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল (যেমন উদ্‌জান, অম্লজান, অঙ্গারদ্ব্যম্লজ), সেটা আজ পরিত্যক্ত হয়েছে, বরং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দসম্ভারে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে। তবু এক্ষেত্রেও প্রমিতকরণের নীতিমালা অত্যন্ত জরুরি। কেননা তার অভাবে বিভিন্ন লেখক একই জিনিস বোঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করছেন।

- **প্রকাশনার উচ্চ ব্যয় :** বিজ্ঞানের বইতে স্বভাবতই নানা ছবি, ছক, সংকেত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়; বইয়ের আকারও অনেক ক্ষেত্রে বড় হয়। এসব কারণে সাধারণ একটি বইয়ের তুলনায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সংক্রান্ত বইয়ের প্রকাশনা ব্যয় বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বইয়ের বাজার অপেক্ষাকৃত ছোট বলে একজন সাধারণ প্রকাশকের পক্ষে এ ধরনের বই প্রকাশ ও বাজারজাত করা রীতিমতো দুঃসাধ্য। এজন্যই এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা একান্ত জরুরি।
- **বইয়ের সমকালীনতার সমস্যা:** বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ দ্রুত অগ্রগতি ও রূপান্তর ঘটে চলেছে। এজন্য যে কোন বিজ্ঞানের বই অল্প দু'চার বছর পরই পরিমার্জনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলা একাডেমী এ ধরনের যে সব বই প্রকাশ করেছে তার অর্ধেকের কম বইয়ের এযাবৎ সংস্করণ হয়েছে। স্বভাবতই সময়োত্তীর্ণ বইয়ের সাহায্যে ক্রমপরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার জন্য শুধু যে পাঠ্য বই প্রয়োজন তা নয়। প্রয়োজন আরো নানা ধরনের শিক্ষা-সহায়ক, জ্ঞান ও চিত্তবিকাশমূলক বই। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ পথিকৃৎ লেখকদের ভূমিকা স্মরণীয়। সাম্প্রতিককালে কাজী মোতাহার হোসেন, মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা, এম এ জব্বার, জহুরুল হক, এ এম হারুন অর রশীদ, আলী আসগর, তপন চক্রবর্তী, সুব্রত বড়ুয়া প্রমুখ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

একদিকে যেমন প্রয়োজন বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জ্ঞান-সম্প্রসারণমূলক বই, তেমনি প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবন ও উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের উপযোগমূলক বই (যেমন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি, পরিবেশ, ইলেকট্রনিক্স এসব বিষয় নিয়ে)। আবার সেই সঙ্গে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিষয়ক আগ্রহসঞ্চারী, কৌতূহলোদ্দীপক বইয়ের প্রয়োজনও কম নয়। এসব ক্ষেত্রে দেশে আজ কিছুটা কাজ হচ্ছে, তবে তাকে যথেষ্ট বলা যায় না। বিদেশে ক্রমাগত যে বিপুল গবেষণাকর্ম চলেছে তার মধ্য থেকে নির্বাচিত রচনা বাংলায় ব্যাপক সংখ্যায় অনুবাদ করা প্রয়োজন। দেশে যে সব গবেষণার কাজ হচ্ছে তাও ক্রমাগত বাংলা ভাষায় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এসবও এখনও যথেষ্ট পরিমাণে হয় না।

আগামী দিনের সম্ভাবনা

আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন বার বার তুলে ধরেছেন। প্রধান দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে: উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন

ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা, দেশীয় ও সুলভ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব, সেকেলে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্যবই, শিক্ষক-নির্দেশিকা ও শিক্ষাক্রম-সহায়ক উপকরণের সমস্যা। মুখস্থবিদ্যা নির্ভর সনাতন ধারার শিক্ষাদান পদ্ধতি একটি গুরুতর সমস্যা। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানের মূলনীতির বিরোধী—কেননা বিজ্ঞান মূলগতভাবে নতুন নতুন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান উদ্ভবের ওপর জোর দেয়।

প্রযুক্তি শিক্ষার বেলাতেও একথা সত্য। ঐতিহ্যগতভাবে এদেশে শিক্ষাকে 'বাবু' বা 'সাহেব' শ্রেণীর জীবিকার প্রবেশপথ বলে গণ্য করার প্রবণতা রয়েছে। সেজন্য হাতে-কলমে কাজ ও উৎপাদনমূলক দক্ষতার দিকে তেমন দৃষ্টি নেই। আর তাই একদিকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষিত যুবকের বেকারত্ব আর অন্যদিকে কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রকট অভাব –এই বৈপরীত্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। দেশে প্রযুক্তিশিক্ষার বিকাশও হয়েছে ভারসাম্যহীন। যে পরিমাণ প্রকৌশলী, চিকিৎসাবিদ ও অন্য পেশাজীবী সৃষ্টি হচ্ছে সে অনুপাতে প্রযুক্তিবিদ ও কুশলী কর্মী সৃষ্টি হচ্ছে না; এটা পেশাজীবীদের পূর্ণ ব্যবহারে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের সুযোগ রয়েছে। এদেশের পরিকল্পনাবিদরা আজ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ জনশক্তির উন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। আজকের দিনে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক যেভাবে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে তাতে জনশক্তির বিকাশের জন্যও প্রয়োজন এমন শিক্ষা যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসাকে তীক্ষ্ণ করে, উৎপাদন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ওপর জোর দেয়। এজন্য দেশব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যাপক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আয়োজন প্রয়োজন; আর চাই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণা ও সেই গবেষণার ফলাফলকে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এদেশের মানুষ যাতে আজকের গভীর দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির পথে এগোতে পারে তার জরুরি তাগিদেই এ সবের প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বইয়ের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কাজেই এ ধরনের বইয়ের প্রকাশনা হয়তো চিরদিন অলাভজনক থাকবে না। তখন প্রকাশকরা এক্ষেত্রে আরো উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। তবে এসব বই যাতে উঁচুমানের ও আধুনিক তথ্যসম্বলিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। কেননা তা না হলে আমাদের শিক্ষার মান ক্রমেই আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে নিচে নেমে যাবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। একই কথা গবেষণামূলক রচনা সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

পাঠ্যবই ও গবেষণামূলক রচনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রচুর জনপ্রিয় রচনার প্রয়োজন রয়েছে। চাষবাস, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, মৌলিক বিজ্ঞান, নানা ধরনের প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দেবার জন্য দরকার অসংখ্য বই।

এমন বই যা মানুষকে সাহায্য করবে তার চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার জবাব পেতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, জীবনকে সুন্দর ও প্রাচুর্যময় করতে।

দেশে আজ বাংলা ভাষায় বেশ ক'টি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তরুণ বিজ্ঞানীকর্মীদের উদ্যোগে কয়েকশ' বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগে অংশ নিতে হবে দেশের সব বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের, সকল শিক্ষিত মানুষকে। এর মধ্য দিয়েই দেশের সকল স্তরের মানুষের জীবনে আসতে পারে স্বাস্থ্য, স্বস্তি, সমৃদ্ধি আর আনন্দের ছোঁয়া; আর তবেই সার্থক হবে একুশের শহীদদের পবিত্র আত্মদান।

একাডেমীর কাছে প্রত্যাশা

বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠার পর দেখতে দেখতে চার দশক সময় পেরিয়ে গেল। যে সব লক্ষ্য নিয়ে একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল সেকথা আর এই সময়ের মধ্যে সেসব লক্ষ্য অর্জনে আমরা কতটা এগিয়েছি তার কথাই আজ আমাদের মনে পড়ে সবার আগে।

মাত্র চল্লিশ বছর সময় একটি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে খুব দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু তবু এই সময়ের মধ্যে দেশে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, কাব্য-নাটক-উপন্যাস প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কর্মপ্রবাহ এবং সর্বোপরি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব এমনি নানা ঘটনা ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের গতিময়তারই পরিচয় দেয়।

একদিক থেকে মানতেই হবে আমাদের দেশ এক দুর্ভাগা দেশ। দু'শ' বছরের শোষণ আর বঞ্চনা এদেশের হাড় মজ্জা কুরে কুরে খেয়েছে। তবে এদেশের জনগণ সে অবস্থাকে কখনোই মুখ বুজে মেনে নেয় নি; নানা বিচিত্রমুখী প্রবণতা সত্ত্বেও বারবার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তারা উচ্চকণ্ঠ হয়েছে, ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ সত্ত্বেও উন্নত নতুন জীবনের জন্য সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছে। একদিকে ইংরেজের ভেদবুদ্ধি, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের স্বার্থান্ধতা তাদের এই সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এসবই যেমন পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তেমনি কালে কালে তার বিনাশেরও কারণ হয়েছে।

তবে এর মধ্যেও মানুষের মনে ধিকি ধিকি জ্বলেছে আশার আলো। এদেশের মানুষ বারবার রক্ত দিয়ে তাদের জীবনের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তারা রক্ত দিয়েছে ভাষার আন্দোলনে, আরো বেশি দিয়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের রক্ততর্পণের মাধ্যমেই মূলত বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা; তাই এই শহীদদের

কাছে আমাদের ঋণের সীমা নেই। তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে আমাদের সবার জীবনের পথকে আলোকিত করেছেন, আমাদের জীবনের বিকাশের পথ থেকে এক জগদ্দল বাধাকে অপসারিত করেছেন।

৫২-র ভাষা আন্দোলন আর ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আমাদের কতকগুলো জাতীয় প্রতীক চিহ্নিত করে দিয়েছে। বাংলা ভাষা, একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ মিনার, বাংলা একাডেমী, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা — এসব শব্দের সঙ্গে এমনি প্রতীকী অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। এধরনের প্রতীক আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথে শক্তিশালী অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে। আজকের দিনে আমাদের জীবনের চারপাশে ছড়ানো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতির চিহ্নের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান অহরহ শুনতে পাওয়া যায়। জাতীয় অগ্রগতির জন্য অবশ্যই ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য একান্ত প্রয়োজন। এই ঐক্যের পথে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে পাওয়া প্রতীকী ব্যঞ্জনাগুলোর শক্তিশালী ভূমিকা থাকতে পারে।

প্রতীকমাত্রেরই যেমন আবেগিক দিক আছে তেমনি প্রায়োগিক দিকও আছে। মায়ের ও ভাইয়ের মুখের ভাষার মান রাখার জন্য ভাষা সংগ্রামের অকুতোভয় সেনানীরা প্রাণ দিয়েছিলেন। তবে একথা তো সত্য যে, শুধু মায়ের মুখের ভাষা আমাদের খুব বেশিদূর এগিয়ে নেয় না, ভাষার পরিধি মুখের ভাষার চেয়ে আরো বহুদূর বিস্তৃত। সাহিত্যের, জ্ঞানচর্চার বা কাজের প্রয়োজনে আমরা প্রায়শ এমন ভাষা ব্যবহার করি যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। শুধু মায়ের মুখের বুলি নয়, জাতীয় অগ্রগতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই আমাদের এক বিকশিত ভাষার চাহিদা আজ ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে।

পণ্ডিতজনেরা বলেন, ভাষা যেমন জীবনযাপনের অবলম্বন, তেমনি উৎপাদনেরও হাতিয়ার। বিকশিত জীবনের জন্য উৎপাদনশক্তির বিকাশ চাই—তার জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ শব্দসম্ভার, বিকাশমান প্রকাশভঙ্গি। আমাদের ভাষা ও সাহিত্য এই প্রয়োজন কতখানি সিদ্ধ করছে সে প্রশ্ন নিরবচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করার দায়িত্ব তাই এড়ানো যায় না। ভাষা আন্দোলনের সময় যে সব দেশ জীবনমানের দিক দিয়ে আমাদের পাশাপাশি ছিল, এমনকি আমাদের চেয়েও পেছনে পড়ে ছিল—তারা আজ অনেকে আমাদের বহুদূর পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। শুধু ভাষার জন্য আবেগ ও উদ্দীপনা আমাদের এই পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। আজ তাই সামগ্রিক সামাজিক-আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও লালনের ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন। আর সে উদ্যোগে আমাদের জাতীয় প্রতীকী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর স্বভাবতই একটি বড় ভূমিকা থাকবে।

মানব সম্পদ ও মাতৃভাষা

ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের মুক্তি সংগ্রাম এদেশের মানুষের সামনে পরিপূর্ণ বিকাশের যে আশ্বাস ও কর্মসূচি তুলে ধরে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে বড় একটা স্থান নিয়ে আছে শিক্ষাব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রসঙ্গ। মাতৃভাষাকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে দেশব্যাপী দ্রুত সর্বজনীন, একমুখী বুনিয়াদি শিক্ষা বিস্তার ছাড়া আমাদের এই পিছিয়ে পড়া দেশটির অগ্রগতি ও বিকাশের আর কোন পথ খোলা নেই—এ বিষয়ে কারো দ্বিমত হবার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। সেই সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও বাংলা একাডেমীর ভূমিকার দিকে।

এদেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রবর্তিত হয়েছিল ত্রিশের দশকের শেষে। ষাটের দশকে উচ্চশিক্ষার স্তরেও হাঁটি হাঁটি পা পা করে বাংলা ভাষার প্রবর্তন শুরু হয়। কিন্তু এই স্তরে নানা বিষয়ের পঠন-পাঠনের জন্য যে পরিমাণ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন চার দশক পর আজও তার অর্ধেকও বাংলা ভাষায় লভ্য নয়। তাছাড়া জ্ঞানের বিষয়ে বইপুথি তো এমন নয় যে, একবার একটি বই লিখে ফেললেই সমস্যা মিটে গেল। আজকের দিনে জ্ঞানের বিপুল বিস্ফোরণ ঘটছে; একই বিষয়ে ক্রমাগত অসংখ্য নতুন নতুন বইয়ের চাহিদা দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকার পরিস্থিতি বইয়ের চেয়ে আরো শোচনীয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ক্রমাগত নানা আদেশ-নির্দেশ জারির পর অবশেষে প্রশাসনিক কাজে সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার চালু হয়েছে। কিন্তু তবু এই ভাষার অধিকার আয়ত্ত মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সাক্ষর লোকের। বাকি যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক আজো নিরক্ষর তাদের উৎপাদনমূলক কাজে বা চিত্তবৃত্তির বিকাশে বাংলা ভাষার জ্ঞান তেমন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এই পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রার মানে। এদেশে ভূমিহীন, নিঃস্ব ও অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বাড়ছে; দেশের গড় জীবনযাত্রার মানে যে সামান্য উন্নতি দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে গড় জীবনযাত্রার মান বাড়ছে তার চেয়ে দ্রুত—আর তার ফলে চার দশক আগে যে সব দেশ ছিল আমাদের সমপর্যায়ে তাদের চেয়ে আজ আমরা অনেক বেশি দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছি। এই পরিস্থিতি কোন স্বাধীন দেশের পক্ষেই গৌরবজনক হতে পারে না।

এ থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা ভাষার লড়াইয়ের শুধু একটি প্রাথমিক ধাপমাত্র। এর আনুষঙ্গিক অবশ্যকরণীয় পদক্ষেপ হল দেশের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতাকে বিস্তৃত করা এবং উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

ও মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশে এই ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এই পরবর্তী দু'টি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমরা আজো তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করি নি।

দেশে ব্যাপকভাবে গণশিক্ষার বিস্তার না ঘটলে সব মানুষের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বিস্তৃত করা সম্ভব নয়। আধুনিককালে সভ্যতার অগ্রগতির একটি প্রধান নিয়ামক হল উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ। মানুষ এই উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে চারপাশের প্রকৃতির বিধি-বিধান উদ্ঘাটন করে, নতুন প্রযুক্তিজ্ঞানের মাধ্যমে সে সব বিধি-বিধানকে উৎপাদনের কাজে, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করে। উন্নত দেশগুলো উৎপাদনশক্তির বিকাশের মাধ্যমেই তাদের জনগণের জীবনমান বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আর আমরা যে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি সেও উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারি নি বলেই।

আধুনিককালে উৎপাদনশক্তির বিকাশ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য যে ভাষা জ্ঞান প্রয়োজন তা কোন দেশেই মানুষের আদি মাতৃভাষা নয়—সংকেত ও প্রতীকে সমৃদ্ধ মাতৃভাষার এক উন্নত বিকশিত রূপ। বাংলা ভাষার এই উন্নত বিকশিত রূপ নির্মাণের উদ্যোগ আজ কেবল আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে—কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করার জন্য বিপুল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আনুকূল্যের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলা ভাষার চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অগ্রণী ভূমিকা আজ সর্বজনস্বীকৃত; বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ফসল এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাও অনেক। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমী নানা খাড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গত চার দশকে সমগ্র জাতির এক অতি প্রিয় সংস্কৃতি-প্রতিভূতে পরিণত হয়েছে। ১৯৭২ সালে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নানা পুস্তক বাংলায় প্রণয়নের গুরু দায়িত্ব একাডেমীর ওপর এসে পড়ে। এই একাডেমীতে আজ ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা; গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর; পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি নানা বিভাগে কাজ চলছে।

বলাই বাহুল্য এযাবৎ অনেক ভাল কাজ হলেও একাডেমীর কাঠামো ও কাজের ধারায় এখনও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একাডেমী বর্তমানে চলছে ১৯৭৮ সালে প্রবর্তিত একটি অধ্যাদেশের বলে। অধ্যাদেশটির পরিবর্তে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণীত হবার কথা বহুকাল থেকে শোনা যাচ্ছে। চার দশক পরেও একাডেমীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণীত না হবার ফলে একাডেমীতে সদস্যভুক্তির কোন সুষ্ঠু বিধি নেই; কার্য-নির্বাহী পর্ষদের একটি বড় অংশ সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচনের বিধান ছিল, তাও আজ কার্যত স্থগিত।

তৃতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনাকালে (১৯৮৫-৯০) উচ্চশিক্ষা স্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন প্রকল্প মিলিয়ে পাঁচ বছরে বাংলা একাডেমীর জন্য উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ছিল সর্বসাকুল্যে বছরে এক কোটির সামান্য বেশি; কিন্তু কার্যত পাওয়া যায় বছরে গড়ে এক কোটিরও কম। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কিছু বেড়েছে, কিন্তু তা একাডেমীর কাজে কোন রকম গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। এ থেকে বোঝা যায় জাতীয় নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে বাংলা একাডেমীকে যে তেমন অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে তার কোন প্রমাণ নেই। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে দেশের জনগণের যে উচ্চ আশার প্রতিফলন ঘটেছিল বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার বাস্তবায়ন আজও সুদূরপরাহত হয়ে আছে।

একুশ শতকের পথে

ইতিহাসের এক সর্পিল যাত্রাপথে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মানুষ আজ একুশ শতকের নতুন আলোকোজ্জ্বল অঙ্গনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। আজকের মানবসভ্যতার নির্মাণে অংশ গ্রহণ করেছে নানা দেশ ও নানা জাতির মানুষ। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে নানা দেশের মানুষ নানাভাবে অবদান রেখেছে এই সভ্যতার মনোরম সৌধ ও পুষ্পিত কাননের সংগঠনে ও বিন্যাসে। সভ্যতার এই বিশাল অঙ্গনটি ক্রমাগত বিকাশমান—নানা দেশের মানুষের শ্রম ও মেধার সমাবেশে তার বহুভঙ্গিম অবয়বটি গড়ে উঠেছে। এই অবয়বের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সারা পৃথিবীর নানা বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র ভাষার মানুষ আজ এক সুতোয় গাঁথা হয়েছে। এই বিশ শতকে পৌঁছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ যেমন কাছাকাছি এসেছে এমন এর আগে আর কখনো হয় নি। তথ্য-প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়ে আরো প্রবল ঘনিষ্ঠতা, জ্ঞানের জগতে আরো বিপুল অগ্রগতি আজ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এমন কাছাকাছি এসেও সারা পৃথিবীর মানুষ যে সব দিক থেকে একই মানে পৌঁছেছে তা বলা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন মুছে ফেলা যায় না, তেমনি নানা দেশে বিকশিত হয়েছে নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি, জীবন-যাত্রার নানা বিশিষ্ট ধরন। আর এমনি নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সমাহারে গড়ে উঠেছে সমগ্র মানব জাতির এক বিশাল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

পৃথিবীজোড়া এই মানবসংস্কৃতি বা মানবসভ্যতার বিকাশে কার অবদান বেশি বা কম তা বলা সহজ নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আফ্রিকা, কখনো মধ্যপ্রাচ্য, কখনো দূরপ্রাচ্য, কখনো মধ্য-আমেরিকা, কখনো ভারতবর্ষ বা ইউরোপ। দেশে দেশে ক্রমাগত লক্ষ কোটি মানুষের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে আজকের সভ্যতার বিশাল অবয়বটি।

এমনি বিপুল বিচিত্র মানবসভ্যতার অঙ্গনে আমাদের বাংলাদেশের স্থান কোথায় এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষের চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে তাদের কারুকর্মে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে, কাব্যে, সাহিত্যে, নির্মাণে, উৎপাদনে। উন্নত জীবনের জন্য মানুষ কখনো সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে তার পরিবেশের বিরুদ্ধে, কখনো তার সমাজ-সংগঠনের বিরুদ্ধে। আবার কখনো মানুষকে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়েছে তার নিজেরই সত্তার সঙ্গে—তার প্রচুর নিদর্শন আমরা জীবনে ও সাহিত্যে দেখে থাকি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতির আন্দোলনের আজকের উত্তরাধিকারকে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর কতটা এগিয়েছি আমরা আমাদের ভাষার বিকাশে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অঙ্গীকারে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, দেশের সব মানুষের জন্য উন্নত জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে? এ থেকেই স্থির করা যেতে পারে এরপর কোথায় যেতে চাই আমরা—আর কি করে যাওয়া যাবে সেদিকে।

সুখের বিষয় এই যে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির মতো আমাদের ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা তাও স্থাণু নয়, ক্রমাগত বিকাশমান। ক্রমবিকাশমান বলেই তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে। আর ঠিক এ কারণেই যে সব সীমাবদ্ধতা আজো আমাদের পিছু টানে সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে অতিক্রম করার সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত উদ্যোগ প্রয়োজন।

চার দশকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা মূলত উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠার একটি অবলম্বন—নিজেই কোন পরম লক্ষ্য নয়। যে ভাষা দেশের সব মানুষের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তার ওপর জন্মায় দেশের প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার। প্রত্যেক মানুষকে তাই সমান সুযোগ দিতে হবে সেই ভাষাকে ব্যবহার করে তার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ আর আনন্দময় করে তোলার জন্য।

পরাধীন দেশে ভাষার অধিকার দেশের সব মানুষের থাকে না; বিদেশি প্রভুরা নিজেদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয় যাতে সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা থেকে দূরে রাখা যায়। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশেও যে ভাষার ওপর সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। একটি ক্ষুদ্র ক্ষমতাবান গোষ্ঠী যদি রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে তাহলে তাদের পক্ষেও সম্ভব সাধারণ মানুষকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে ঠেলে রাখা, মাতৃভাষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা ভাষার অধিকার সঙ্কুচিত করার একটি সহজ উপায়।

ভাষার অধিকারকে যদি দেখা হয় শুধু দৈনন্দিন জীবনযাপনে মাতৃভাষা প্রয়োগের অধিকার হিসেবে তাহলে সেটা হবে খুবই এক সংকীর্ণ দৃষ্টি। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন

বলতে আসলে বোঝায় উৎপাদন, প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ থেকে বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতি চর্চার সকল ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি। এক নতুন গণতান্ত্রিক রূপান্তর এই সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রবলভাবে অবারিত করতে পারে। তখন এদেশের মানুষের অমিত শক্তি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে স্ফুরিত হবে—এই আশা প্রগতিকামী সব মানুষের মনে অনির্বাণ শিখার মতো দীপ্যমান।

লক্ষ্য স্পষ্ট হওয়া চাই

আমরা যে আজ যথেষ্ট দ্রুত এগোতে পারছি না তার একটি কারণ অবশ্যই আমাদের দোদুল্যমানতা। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আমরা যে পরিমাণে আবেগাপ্লুত ও উচ্চকণ্ঠ, সে অনুপাতে কর্মনিষ্ঠ নই। প্রায় বছরই একুশে ফেব্রুয়ারির আগে জীবনের সকল স্তরে বাংলা ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলী জারি হয়; প্রতিবারই মনে হয় এই নির্দেশ চূড়ান্ত—কিন্তু ফেব্রুয়ারি অতিক্রান্ত হলে আর সে নির্দেশাবলীর কথা অনেকেরই তেমন স্মরণ থাকে না। জীবনের সকল স্তরে বাংলা প্রচলনের জন্য উচ্চ পর্যায়ে ভাষা কমিটি গঠন করা হয়; কিন্তু সে কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না। উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব বাংলা একাডেমীর ওপর অর্পিত হয়; কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ সম্পদ বরাদ্দ হয় তাতে প্রয়োজনীয় উচ্চমানের বাংলা গ্রন্থাবলীর মাত্র এক অতি ক্ষুদ্রাংশ প্রস্তুত করা সম্ভব।

ভাষা আন্দোলন আমাদের সামনে যে দায়িত্ব এনে দিয়েছে এবং যে প্রত্যাশার সৃষ্টি করেছে তা পূরণ করতে হলে আজকের এই দোদুল্যমানতা আমাদের পরিহার করতে হবে। সমাজের উচ্চ স্তরের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিদেশের মুখাপেক্ষী বলে বা অন্য কারণে বাংলা ব্যবহারে নিস্পৃহ; কিন্তু দেশের আপামর সাধারণ মানুষের স্বার্থ নিহিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যে গতিতে এগোচ্ছি তাকে মোটেই সন্তোষজনক বলা চলে না। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ দ্ব্যর্থহীন এবং সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য এর অর্থ এ নয় যে, ইংরেজি বা আর কোন বিদেশি ভাষাকে আমরা বর্জন করব। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবনমানের বা ভাষার বিকাশের জন্য দেশ-বিদেশের মধ্যে ভাবের ব্যাপক আদান-প্রদান অপরিহার্য। বাংলা ভাষা চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রের জন্য উচ্চমানের ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি ভাষা চর্চার সুযোগ অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। তা নইলে আমরা বিশ্বের দ্রুত বিকাশমান জ্ঞানভাণ্ডার ও সংস্কৃতি সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। আমরা যখন বাংলা ভাষার বিকাশ চাই তখন বিদেশের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখতে চাই না। বিদেশ থেকে অবশ্যই আমাদের অনেক নিতে হবে এবং সাধ্যমতো দিতেও হবে। এই দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে

বিদেশি ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ইংরেজি, আরবি, ফরাসি, রুশ প্রভৃতি বিদেশি ভাষা চর্চার যথাযোগ্য সুযোগ আমাদের জাতীয় স্বার্থেই শক্তিশালী করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে বিদেশি ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় ভাষার চর্চা বা অগ্রগণ্যতা যেন কোনভাবে ক্ষুণ্ন না হয়।

আমাদের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা নিঃসন্দেহে এদেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে গত চার দশকের বেশি সময়ে আমাদের সাক্ষরতার হার আদৌ বাড়ে নি বললেই চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যা নিশ্চয়ই কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে সব ছেলেমেয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না —এ লজ্জা রাখার আমাদের জায়গা নেই।

ভাষার অধিকার একটি জনগোষ্ঠীর নিশ্চয় প্রয়োজন। কিন্তু শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা কখনো চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। ভাষা একটি অবলম্বনমাত্র—জীবনযাপন ও জীবনের বিকাশের জন্য ভাব প্রকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যম হিসেবে ভাষা প্রয়োজন। বাংলা ভাষার ব্যবহারও প্রয়োজন দেশের সকল স্তরের মানুষের জীবনকে সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। আর ঠিক একারণেই যে দেশে দুই-তৃতীয়াংশ লোকের আদৌ অক্ষরজ্ঞান নেই সে দেশে ভাষার বিকাশ বা প্রয়োগ নিতান্ত খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের সংবিধানে ব্যবস্থা রয়েছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের। ইতোমধ্যে আইন প্রণীত হলেও তার প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা বোঝা দুঃসাধ্য। দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য অর্জনের সংকল্প ঘোষিত হয়েছে; কিন্তু বিজ্ঞানীদের জরিপে ধরা পড়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের গড় পুষ্টিমান গত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত নিম্নগামী। আজকের দিনে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন না করে জনসাধারণের পুষ্টিমান বাড়ানো সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য অর্জনও। ভাষার দাবির সঙ্গে আজ তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে এদেশের নিরন্ন মানুষদের মুখে অন্নের যোগান, সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অধিকারের প্রশ্ন।

এখান থেকে আমরা কোথায় যাব, কোন্ পথে যাব তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার হোক তা আমরা নিশ্চয় চাইব। আমরা চাইব এই ভাষায় সমৃদ্ধি আনতে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা এও চাইব এই ঐশ্বর্য যেন কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে সমাজের গুটিকতক মানুষের হাতে! সারা দেশের মানুষ শক্তিশালী হয়ে উঠুক আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্যময় ভাষার হাতিয়ার ব্যবহারে, সম্পদশালী হোক

আমাদের ঐশ্বর্যময় ভাষার সৌকর্যে, জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলুক এক উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে—আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে যথাযথ শক্তি অর্জন করুক বাংলা একাডেমী—এই হোক আমাদের একান্ত কামনা।

সংস্কৃতির সংকট ও সম্ভাবনা

এদেশের একজন বিদগ্ধ লেখক মোতাহার হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতির বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে: "... সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা ... বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।"

এই যে মানুষের সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠা, প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তার, সুন্দরভাবে মহৎভাবে বাঁচা—এর মধ্যে আরো কিছু কথা উহ্য থেকে যায়; সে হল তার মেলবন্ধনের, যৌথ জীবনের, তার জীবন সংগ্রামের আর মহত্ত্বের ধারণা। যেখানে মানুষ ঐক্যবদ্ধ, সৃষ্টিশীল সেখানেই সে শক্তিমান, মহৎ। মানুষের যা কিছু মনুষ্যত্ব, সৃষ্টিশীলতা, সৌন্দর্য চেতনা, নৈতিকতা—সবই তার সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের এই সংস্কৃতি চেতনা বহু হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন আর ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। আর এই চেতনা বলাই বাহুল্য কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার বলে গণ্য হতে পারে না। পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিস্তর পার্থক্য দেখা গেলেও তার মধ্যে মানবিকতার এক আশ্চর্য যোগসূত্র দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বহু হাজার বছর ধরে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার একটি প্রধান চরিত্র হল তাতে নানা জাতির, নানা ভাষাভাষী মানুষের বিপুল মিশ্রণ ঘটেছে। এদেশের অতি উর্বর মাটি, বর্ষণসিক্ত আকাশ, মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন নানাদেশ থেকে অভিযাত্রীদের আকৃষ্ট করেছে তেমনি এখানকার সমন্বয়ধর্মী সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাদের

[২৬ অক্টোবর ১৯৯৫ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর অষ্টম জেলা সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ]

এখানকার সমাজে মিলে মিশে এক হয়ে যেতেও সহায়তা করেছে। এই মিলিত সংস্কৃতি এক হিসেবে দেখলে এদেশের সংস্কৃতির একটি বিশেষ শক্তির দিক। এমনি মেশামেশি যেমন ঘটেছে এই অঞ্চলের মানুষের অবয়বে, তেমনি তাদের পোশাকে, ভাষায়, আচার-আচরণে, শিল্প-সাহিত্যে, ধর্ম-কর্মে। নানা ধর্মের, নানা মতের এমনি মেশামেশি যেখানে ঘটে সেখানে স্বভাবতই সংঘাতের চেয়ে সমন্বয়ের বাণী প্রধান হয়ে ওঠে।

মনুষ্যত্বের জয়গান যেখানে উদাত্তভাবে গাওয়া হয় সেখানে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ তুচ্ছ হয়ে একতার বাণী প্রধান হয়ে ওঠে। এদেশের বাউল কবি তাঁর গভীর উপলব্ধির আলোকে বলেন:

নানা বরণ গাভী রে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।

এদেশের কবি আর গায়কেরা এমনি করে চিরকাল গেয়ে এসেছেন মানবতা আর মানুষের একতার গান। তবে যেখানে মানুষের কাছে কোন বিশেষ ধরনের বিসদৃশতা ধরা পড়েছে সেখানে তাদের মধ্যে উগ্রতার প্রকাশ ঘটে নি তা নয়। যেমন সপ্তদশ শতকে মোগল দরবারে ফার্সির প্রাধান্যের যুগে বাংলাদেশে বাস করেও যারা বাংলাভাষার অনুরাগী নয় তাদের প্রতি কবি আবদুল হাকিম তাঁর তীব্র ক্ষোভ আর স্বাদেশিকতার প্রকাশ ঘটিয়ে লেখেন:

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী ;
সে-সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায় ।।

এদেশের অতীত ইতিহাসে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আছে; সমন্বয়, সম্প্রীতি আর গভীর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ আছে; ভাষার জন্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার আছে; তেমনি আবার মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক সীমাবদ্ধতাও আছে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, আবেগপ্রবণতা, উদ্যমহীনতা, পরচর্চা—এমনি নানা সমস্যায় এদেশের বহু মানুষের জীবন ভারাক্রান্ত। মানুষের এধরনের দুর্বলতার মূলে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থনীতিক নানা কারণ রয়েছে। যেমন আছে এদেশের কোমল-পেলব প্রকৃতি আর সহজ জীবনযাত্রা, তেমনি আছে দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও শোষণের প্রভাব, সামন্ততন্ত্রের অবশেষ, ব্যাপক গভীর দারিদ্র্য, আর বিজাতীয় ভাবধারার কাছে সহজ বশ্যতা স্বীকারের প্রবণতা। বাঙালি চরিত্রের এধরনের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেই, হয়তো কিছুটা কাব্যিক অতিশয়োক্তি মিশিয়ে, প্রায় এক শ' বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এভাবে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন :

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ কর নি।
—বঙ্গমাতা (১৩০২)

নানা সম্ভাবনা

বহু হাজার বছর ধরে মানুষের হাতের দক্ষতা বেড়েছে; তার মগজের আকার শুধু বড় হয় নি, সে মগজে স্নায়ু সংযোগের সূক্ষ্মতা আর নৈপুণ্যও বেড়েছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ গড়ে তুলেছে নানা হাতিয়ার, যৌথ জীবনের উপযোগী ভাষার শৈলী, সে ভাষায় আরোপ করেছে কাব্যের সৌন্দর্য, জীবনকে নানা দিক থেকে সুন্দর করে তোলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে সুরের ঐশ্বর্য। এদেশের প্রকৃতির অবারিত দাক্ষিণ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল মন নানা ধরনের সুকুমার শিল্পে তাদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটিয়েছে। এ প্রকাশ প্রধানত ঘটেছে সংগীতে, নৃত্যে, পটের আল্পনায়, পালা-পার্বণে এবং দৈনন্দিন জীবনের আরো নানা শিল্পরূপের মাধ্যমে। কীর্তন, বাউল, ভাওয়াইয়া, জারি, মুর্শিদা, মারফতি, গম্ভীরা, কবিগান ইত্যাদি নানা প্রকাশভঙ্গিতে মানুষ তাদের সৌন্দর্য চেতনার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে।

লোকজ সংস্কৃতির যে ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত তার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এদেশের সকল ধর্মের, সকল গোত্রের মানুষ মিলেই তা সৃষ্টি করেছে। তাতে গভীর জীবনবোধের কথা আছে, মানুষে মানুষে ঐক্য ও প্রীতির কথা আছে। নগর সংস্কৃতির তেমন আনুকূল্য না পেলেও এই সাংস্কৃতিক ধারা এদেশের মানুষের জীবনে দীর্ঘকাল ধরে রস সিঞ্চন করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে এই সংস্কৃতির ওপর কিছুটা নগর সংস্কৃতির ছাপ পড়তে আরম্ভ করেছে; জনগণের জীবন-সম্পৃক্ত কিছু কিছু আধুনিক বক্তব্য নিয়ে নতুন ধরনের নাটক ও সংগীতও গ্রামাঞ্চলে পৌঁছতে শুরু করেছে। কিন্তু সে ধারা এখনও অতিমাত্রায় ক্ষীণ। আজও গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতি ও নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান ঘোচাবার জন্য যে ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন তার লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অধ্যাত্মচিন্তা, বোধ আর অনুভূতির এলাকায় যতটা সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ব্যবহারিক জীবন বা উৎপাদন ব্যবস্থায় তার ছাপ ততটা পড়ে নি। এধরনের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটা বড় সমস্যা হল গত তিন-চার শ' বছরে পাশ্চাত্য জগতে যে বিশাল বিপুল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লব ঘটেছে তার প্রভাব বলয় থেকে আমরা যেন অনেকটা বাইরে পড়ে রয়েছি। আমাদের পাশের দেশ ভারতে তবু জাতীয় পুঁজির বিকাশের ফলে কিছুটা শিল্পায়ন ঘটেছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনের দৃষ্টান্তও অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়। দু'যুগের

পাকিস্তানী শাসনে মূলত কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ সে সুযোগটুকুও পায় নি, অথচ প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী বিপুল বেগে এগিয়ে চলেছে; আমাদের জন্য যে অন্যরা অপেক্ষা করে থাকবে সে সম্ভাবনা আজ একেবারেই নেই।

আজ থেকে প্রায় চার শ' বছর আগে ইংরেজি সপ্তদশ শতকের শুরুতে গ্যালিলিওর পরীক্ষানির্ভর বিশ্ববীক্ষার পর থেকে প্রকৃতিজগতের রহস্য সন্ধানে মানুষের বিপুল অভিযাত্রা শুরু হয়; সে ধারা গত শতাব্দীতে এসে বহুগুণে ত্বরান্বিত হয়েছে। উনিশ শতকে জীবাণুতত্ত্বের আবিষ্কার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। তার ফলে গত এক শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে মানুষের গড়পড়তা আয়ু প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে; এধরনের আয়ুবৃদ্ধি দরিদ্র বাংলাদেশেও ঘটেছে। যেখানে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে লেগেছিল প্রায় দু'শ' বছর আর উনিশ শতকে পুরো এক শ' বছর সেখানে গত এক শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে তিনগুণের ওপর। এই এক শ' বছরে বিদ্যুৎশক্তি, বেতার যোগাযোগ, পরমাণু-রহস্য, আপেক্ষিকতত্ত্ব, কোয়ান্টামতত্ত্ব, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, মহাকাশ বিজয়, জৈব প্রযুক্তি, আশ্চর্য গুণাগুণ-সম্পন্ন অসংখ্য নতুন বস্তুর উদ্ভব—এমনি অন্তহীন আবিষ্কারের মিছিল মানুষের সামনে অগ্রযাত্রার এক বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের এই অভিযাত্রায় বাঙালিদের স্থান আজ কোথায়?

স্থান একেবারে নেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় সাহিত্যক্ষেত্রে আমাদের জন্য এক অসামান্য গৌরবের স্থান এনে দিয়েছেন, সে বলাই বাহুল্য। আজ থেকে প্রায় এক শ' বছর আগেই বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বেতার যোগাযোগ ও উদ্ভিদের সাড়া বিষয়ে তাঁর বিস্ময়কর গবেষণার সম্ভার দিয়ে পাশ্চাত্য জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা এবং আরো অনেকেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের প্রকৌশলী-স্থপতি ফজলুর রহমান খান বিশ্বের সর্বোচ্চ ইমারত 'সিয়ার্স টাওয়ার'-সহ আরো অনেকগুলো অসামান্য স্থাপত্য কর্মের জন্য বহির্বিশ্বে নন্দিত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল: এসব কি যথেষ্ট? এর ফলে কি এদেশের জনগণের জীবনে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটেছে? জগৎসভায় কি বাঙালিরা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে?—তা যে ঘটে নি সেটা খুব ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদের সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরে মূলত ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষের মিলিত সৃষ্টি হলেও আজও তাতে নতুন নতুন প্রতীকচিহ্ন যুক্ত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম যেমন করে সারা দেশের মানুষের মন ছুঁয়েছেন তার আগে এমন আর কোন সাহিত্যিক পারেন নি। সেটা যতটা না তাঁদের কবিতা বা গদ্য রচনার জন্য তার চেয়ে বেশি হয়েছে তাঁদের বিপুল সংখ্যক গানের জন্য। মধ্যশতকে পৌঁছে বাংলা ভাষা এক নতুন ব্যঞ্জনা

নিয়ে বাঙালিত্বের এক প্রধান প্রতীকচিহ্নে পরিণত হয়েছে; বাংলাদেশে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন এই চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই বাঙালিত্বের চেতনা সৃষ্টিতে আরেক জোরালো প্রতীকের কাজ করেছে আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তেমনি আজ নতুন নতুন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলা নববর্ষ, বৈশাখি মেলা আর একুশে ফেব্রুয়ারি।

সংকটও কম নয়

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি আর সম্ভাবনার দিক যেমন আছে তেমনি সমস্যাও কিছু কম নেই। কতকগুলো বড় মাপের সমস্যা দেখা দিচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের ধারা থেকে। আজকের পৃথিবীতে পরিবর্তনের হার হয়ে দাঁড়িয়েছে আগের চাইতে অনেক বেশি দ্রুত; এই দ্রুততাল পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা দুনিয়ার সব দেশেই মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। পৃথিবী আজ যে দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে তার ধাক্কা স্বভাবতই এসে পড়ছে আমাদের সমাজজীবনে; সে অভিঘাতে আমাদের সংস্কৃতির চেহারাও যাচ্ছে বদলে, কোথাও কোথাও সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ দিকের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। এমনি ধরনের কিছু প্রভাবের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে:

- **জনসংখ্যা বিস্ফোরণের চাপ:** পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এই বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে, কিন্তু এখনও সে হার প্রতি বছর দু'শতাংশের কাছাকাছি। গত এক শ' বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেড়েছে। বর্তমান হারে বাড়তে থাকলে দেশের জনসংখ্যা তিন দশকে দ্বিগুণ হবার কথা; আগামী শতাব্দী পেরোতে পেরোতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দশগুণ ছাড়িয়ে যেতে পারে। যদি প্রচণ্ড রকম জন্মশাসন পালন করা সম্ভব হয় তাহলেও আজকের বার কোটি থেকে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি জনসংখ্যা পঁচিশ কোটির ওপরে উঠবে। এ পরিস্থিতির প্রভাব দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্য-আশ্রয়-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর অবশ্যই পড়বে; সাংস্কৃতিক জীবনেও তার ছাপ পড়বে।
- **লোকসংস্কৃতি সংরক্ষার সমস্যা:** জনসংখ্যা বিস্তারের মতোই সারা পৃথিবীতে আজ নগরায়ণের হার বাড়ছে। এই শতকের শুরুতে পৃথিবীতে নগরবাসী মানুষের হার ছিল দশ শতাংশের কাছাকাছি; আজ তা পঞ্চাশ শতাংশ ছুঁই ছুঁই করছে। বাংলাদেশে শতাব্দীর শুরুতে নগরায়ণের হার ছিল দু'শতাংশের মতো; আজ তা বিশ শতাংশের ওপরে। নগরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ও আধুনিক নগর-সংস্কৃতির চাকচিক্যময় নানা উপাদান গ্রামে গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে আরম্ভ করেছে এবং তাতে গ্রামীণ সংস্কৃতির স্নিগ্ধ শুভ্র ধারাটি আজ শুকিয়ে ওঠার উপক্রম করছে।

গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং তার সঙ্গে নগরায়ণের এই প্রবণতা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ কেন এত কঠিন এবং সেই সঙ্গে কেন এমন জরুরি। আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষার কিছু কিছু উদ্যোগ আজ শুরু হয়েছে; কিন্তু ক্রমবিস্তারশীল নগর-সংস্কৃতির প্রভাব ঠেকিয়ে এরা কতকাল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে সে প্রশ্ন তবু থেকেই যায়। অথচ আমাদের সংস্কৃতির মূল শেকড় রয়েছে লোকসংস্কৃতিতে; আজকের এবং আগামী দিনের সংস্কৃতির স্বার্থে তাকে রক্ষার আয়োজন আমাদের সচেতনভাবে করতেই হবে।

- **আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রভাব** : উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে সারা পৃথিবী আজ অতি কাছাকাছি চলে এসেছে। এই নৈকট্যের ধারা আগামী দিনে আরো জোরালো হবে। এধরনের সর্বব্যাপী আন্তর্জাতিক যোগাযোগকে একদিকে যেমন মানবসংস্কৃতির মহৎ ঐতিহ্যের বিস্তারে ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কাজে লাগানো যায় তেমনি আবার একে ব্যবহার করা যায় নিতান্ত ব্যবসায়িক স্বার্থে অতি নিম্নমানের বিনোদনের প্রয়োজনে; শেষের ব্যাপারটিই আজ প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এটি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সংস্কৃতির জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি শক্তিমান দেশের পক্ষে আজ অপেক্ষাকৃত ছোট বা পিছিয়ে পড়া দেশের ওপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা খুবই সম্ভব। এভাবে যদি ছোটখাট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার ফলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বসংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- **মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ** : ধীর গতিতে হলেও বাংলাদেশে আজ শিক্ষার প্রসার বাড়ছে। শতাব্দীর শুরুতে এই অঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি; সেখানে আজ এই অঙ্ক ৩৬ শতাংশে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে এ হার বিশ্বহারের অর্ধেকেরও কম; তাই একে আরো দ্রুত বাড়াবার উদ্যোগ চলছে। শিক্ষার প্রসারের উল্লেখযোগ্য ফলের মধ্যে রয়েছে জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস। সমাজের যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দীর্ঘকালের আধিপত্য এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে তারা এ অবস্থাকে সহজে মেনে নিতে পারছে না; তাই এই মহল নানাভাবে শিক্ষা বিস্তার ও নারী প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলরা একদিন নজরুল ইসলামকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল, বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আজ আবার মৌলবাদ মানুষে মানুষে বিভেদের বীজ বুনে মানুষকে বিভক্ত করতে চাইছে; নারী সমাজকে পর্দার অন্তরালে ঠেলে দিয়ে ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের তরুণ সমাজ একদিন নিজেদের জীবন দিয়ে জনগণের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়ার হিংস্র থাবাও এদেশের মানুষ সেভাবেই প্রতিহত করবে।

- নৈতিকতা বোধের অবক্ষয় : দীর্ঘকালের দারিদ্র্য, দ্রুত নগরায়ণ, বিকৃত রাজনীতির প্রভাব, সামাজিক দুর্নীতি, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি কারণে চারপাশে আজ নৈতিকতাবোধের অবক্ষয়ের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। এজাতীয় লক্ষণ শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই আজ মহামারীর মতো দেখা দিয়েছে। একে অবিলম্বে প্রতিহত করতে না পারলে এটি আগামী দিনে আরো মারাত্মক ব্যাধির মতো সমাজদেহে তার বিষাক্ত প্রভাব ছড়াতে থাকবে। এধরনের অবক্ষয়কে পরাভূত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে পারে মানুষের সংস্কৃতি। সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারই সমাজকে রক্ষা করতে পারে এধরনের অবক্ষয়ের সর্বনাশা গ্রাস থেকে। সেজন্য দেশের সব শিশু-কিশোরদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, শৈশবকাল থেকে সচেতনভাবে সংস্কৃতি শিক্ষার আয়োজনও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

আগামী দিনে যাত্রা

আগামী শতাব্দীতে আমাদের সংস্কৃতির সামনে সম্ভাবনা কি? কোন্ পথে আমরা আমাদের সংস্কৃতির মুক্তির পথ খুঁজে পাব?—সংস্কৃতির সংকট নিরসনের হয়তো নানা পন্থা রয়েছে; এসব নানা পন্থার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। তাছাড়া এসব সমস্যার আসলে হয়তো সাদামাটা কোনো সহজ সমাধান নেই। তবু শেষ পর্যন্ত বুঝি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতির মুক্তির পথ!

জাতিসংঘের কর্মসূচি অনুসরণ করে বাংলাদেশ আগামী দু'হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা'র ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা এদেশে এখনও মনে হয় সুদূরপরাহত; আর ২০০০ সালের মধ্যে সরকারি লক্ষ্যমাত্রাতেও বয়স্ক সাক্ষরতার হার আজকের ৩৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে বড়জোর ৬২ শতাংশে নিয়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করা হচ্ছে। দু'হাজার সালের মধ্যে না হোক তার পর পর যত শীগ্‌গির সম্ভব অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করাটা একান্ত জরুরি। আর এ শিক্ষা নেহাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হবে না, এতে থাকবে প্রত্যেক শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের, তাদের মনে চিন্তাশীলতা আর প্রশ্নশীলতার উন্মেষের আয়োজন। এই শিক্ষায় যেমন থাকবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারের ব্যবস্থা, তেমনি থাকবে প্রত্যেক শিশুর সাংস্কৃতিক বিকাশের উদ্যোগ; শিক্ষার ব্যাপারটা

যেন জীবন ও কর্মের জগতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমরা সৃষ্টি করতে চাই একুশ শতকের উপযোগী মানুষ —যে মানুষেরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে সভ্যতার প্রশস্ত পথে।

এমন শিক্ষা যদি প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে তা দেশের সর্বস্তরের মানুষের সৃষ্টিশীলতা বিকাশের পথকে অবারিত করবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, শিল্পদৃষ্টি ও মানবিকতার চেতনা সব মানুষকে আগামী শতাব্দীর উপযোগী নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করবে। আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের নতুন সম্ভাবনার দুয়ার তখন উন্মুক্ত হবে।

শিক্ষার পর যে সমস্যাটা সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে সে হল সংস্কৃতির সেতুবন্ধ রচনার সমস্যা। এই সেতুবন্ধ প্রয়োজন আমাদের সংস্কৃতির শেকড় যেখানে সেই গ্রামীণ সংস্কৃতি আর নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে; সমাজের সকল স্তরের, সকল শ্রেণী-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে; আর আজকের দিনের সমাজ এবং আগামী দিনের সমাজের মধ্যে। মানুষে মানুষে সেতুবন্ধ রচনায় সংস্কৃতির স্বভাবতই একটি বড় ভূমিকা থাকবে।

আমাদের সংস্কৃতির সামনে আজ যে সব বিপদ ওঁৎ পেতে আছে সে সবকেও একবারে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। এমনি বিপদের মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, জীবনের নানা ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের বিস্তার আর নানা ধরনের অপসংস্কৃতি। বিজাতীয় সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতিকে আমরা ঠেকাবার কথা বলি। কিন্তু সে সবকে ঠেকানো সম্ভব হতে পারে নিজেদের সংস্কৃতির ভিতকে আরো মজবুত করে তুলে, তাকে আরো বৈচিত্র্যময়, জনগণের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং জীবনরসে সিঞ্চিত করে। সেই সঙ্গে আগামী প্রজন্মকে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে, গভীরভাবে পরিচিত করে তুলতে হবে যেন এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের অতীতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্ভারের গৌরবের কথা জানতে পারে, তাতে আরো নতুন নতুন সম্পদ যোগ করতে পারে, তাকে আরো ঐশ্বর্যময় করে তুলতে পারে।

একদিন বাংলা গণ্য হত সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর, সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত অঞ্চল বলে। ইতিহাসের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে বাঙালির সেই গৌরবের ঐতিহ্যকে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু আগামী শতাব্দীর জন্য সে সম্ভাবনার দুয়ার এখনও খোলা রয়েছে। বিগত শতকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন হল বাঙালিদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের প্রতিষ্ঠা। আগামী শতকে সারা পৃথিবীতে সেরা গণ্য না হোক, শিক্ষা-দীক্ষা-অর্থনীতিতে পৃথিবীর গড় মানকে ছাড়িয়ে যাওয়া বাঙালিদের জন্য অসাধ্য হবার কোন কারণ নেই।